অয়ন

২০১৫-২০১৬

বার্ষিক পত্রিকা

দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ

স্থাপিত-১৯৬৭

অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ

Scanned with CamScanner

মঞ্চে সাফল্যের স্বীকৃতি প্রদান

আন্তঃ কলেজ ক্রীড়ানুষ্ঠানের সূচনায় পতাকা উত্তোলন

নবীন বরণ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন

Scanned with CamScanner

(দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ)

অয়ন

দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ পত্রিকা

অরঙ্গাবাদ ★ মুর্শিদাবাদ

২০১৫-২০১৬

সম্পাদনা

অধ্যাপক সাধন কুমার দাস

পত্রিকা উপসমিতির সহযোগী সদস্যবৃন্দ

অধ্যাপক ড. সুনীল কুমার দে

অধ্যাপক মহঃ সাবলুল হক

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর মন্ডল

শ্রী ধ্রুবকুমার বারিক

Scanned with CamScanner

সূচীপত্র

১।	মনের কান্ড কারখানা	—	১৩
২।	মা	—	১৬
৩।	সাগর	—	১৮
৪।	ভালোবাসার সংকট	—	১৯
৫।	নীল খাম	—	২০
৬।	আমরা ও তোমরা	—	২০
৭।	ছুটির রূপ কথা	—	২১
৮।	ইঁদুর ও হাতি	—	২৩
৯।	কুসংস্কার	—	২৪
১০।	এই পৃথিবী	—	২৫
১১।	'স্বপ্ন'	—	২৬
১২।	মাষ্টার মশাই	—	২৯
১৩।	হাড়কিপটে নিন্দুক	—	২৮
১৪।	সফল হল প্রেম	—	৩১
১৫।	ভয়ানক রাত	—	৩৩
১৬।	অতিথি	—	৩৫
১৭।	নজরুল স্মরণে	—	৩৬
১৮।	দুটি রম্যরচনা	—	৩৭
১৯।	অসম্পূর্ণ	—	৪০
২০।	ভালোবাসা	—	৪২
২১।	অবহেলিত মা	—	৪৩
২২।	সুখ	—	৪৬
২৩।	কন্যাসন্তান : আশীর্বাদ না অভিশাপ	—	৪৭
২৪।	বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মিড-ডে-মিল	—	৫০
২৫।	যদি আসি	—	৫৪

Scanned with CamScanner

২৬।	তুমি	—	৫৫
২৭।	অরঙ্গাবাদ : নেতাজী স্ট্যাচুর ইতিকথা	—	৫৭
২৮।	বেঁচে নেব আরও একদিন	—	৫৯
২৯।	কিছু কথা	—	৬০
৩০।	'প্রকৃতি'	—	৬১
৩১।	শিক্ষার মান্নোয়নে ছাত্র শিক্ষকের সর্ম্পক	—	৬২
৩২।	বিদায়	—	৬৬
৩৩।	অভাগীর সুখ	—	৬৭
৩৪।	আলো ও আবছায়া	—	৬৯
৩৫।	সর্বনাশের পথে	—	৭৫
৩৬।	মা হারা মেয়ে	—	৭৬
৩৭।	সাধ	—	৭৭
৩৮।	পৃথিবীটা ভুগছে	—	৭৮
৩৯।	মায়াবিদ্ধ	—	৭৯
৪০।	LIFE	—	৮০
৪১।	দুটি কবিতা	—	৮৪
৪২।	আদর্শ মানুষ হওয়ার আহ্বান	—	৮৭
৪৩।	রহস্য ?	—	৯০
৪৪।	সমাজ ও বিলাসিতা	—	৯৩
৪৫।	অরঙ্গাবাদের পূর্ব কথা	—	৯৭
৪৬।	মা	—	৯৯
৪৭।	অবুঝ মন	—	১০০
৪৮।	মা	—	১০১
৪৯।	বড় প্রশ্ন	—	১০২
৫০।	দুটি কবিতা	—	১০৪

Scanned with CamScanner

প্রাক্‌কথন

এই কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে আমার কার্যকাল মাত্র আড়াইবছর। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি কলেজের আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে একটি শৃঙ্খলা আনার। প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও স্থিতিশীলতা আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি সর্বতোভাবে। কলেজের প্রশাসনিক ভবন ও গার্লস কমনরুমের বিন্যাস খানিকটা বদলে নিয়ে, মেন গেটে দু'জন নিরাপত্তারক্ষী রেখে, উট্‌কো ব্যক্তির উৎপাত অনেকটা কমিয়ে ফেলা গেছে। এইসব সিদ্ধান্তের বিরূপ প্রতিক্রিয়া যে হয়নি তা নয়, তবে শিক্ষানুরাগী ছাত্রছাত্রী ও সচেতন অভিভাবকদের সহযোগিতা পেলে আগামীদিনে আরো অনেক প্রতিকূলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

সরকারি নির্দেশ মেনে গত বছর থেকে অনলাইনে সুষ্ঠুভাবে প্রথমবর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এর জন্য পরিকাঠামো তৈরির ব্যাপারে পরিকল্পনা ছিল অনেকদিনের। নতুন পদ্ধতি নিয়ে দুর্ভাবনাও ছিল বিস্তর।

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাতে পারছি যে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে তিনটি বিষয়ে অনার্স পড়ানোর অনুমোদন আমরা পেয়েছি। বিষয়গুলি হল—ভূগোল (**Geography**), সংস্কৃত (**Sanskrit**) এবং প্রাণীবিদ্যা (**Zoology**)। সেই সঙ্গে আরবী (**Arabic**) বিষয়ে **General Course** পড়ানোর অনুমোদনও আমরা এই শিক্ষাবর্ষ থেকে আদায় করে নিতে পেরেছি।

২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক কলেজ পত্রিকা এবার অনেকখানি বিলম্বে প্রকাশিত হল। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।

ড. শ্যামল কুমার মণ্ডল
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
ডি.এন.কলেজ
অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ

Scanned with CamScanner

সম্পাদকীয়

মানবজীবন নিয়ে এই প্রকৃতি প্রতিদিন লিখে চলেছে অজস্র কবিতা। প্রতিটি মানুষের জীবনই এক একটি অখন্ড উপন্যাস। প্রতিটি মুহূর্তেই কোনো না কোনো ভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে ছোটগল্পের তির্যক ব্যঞ্জনা। আমাদের হৃদয়বীণার তারে কখনো তা অনুরণন তোলে, আবার কখনো তা হারিয়ে যায় অলক্ষ্য আকাশের নিঃসীমায়। এমনি করেই আমাদের প্রাত্যহিক দিনলিপির পাতা পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপকরণের ডালা থেকে আমরা খুঁজে নিই যা নিত্য, যা সত্য। এই প্রবৃত্তি মানুষের চিরকালের। নিত্যকালের উপাদানগুলিকে সযত্নে চয়ন করে আমরা সুন্দরের নৈবেদ্য সাজাই। লেখাপড়া শেখার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো যা সুন্দর, যা সত্য তাকে আবিষ্কার করা। আমরাও সবাই এই উন্নতিতর বোধের লক্ষ্যেই চলেছি। আর অয়নের অঙ্গনই হলো সেই অলৌকিক অনুশীলনের ক্ষেত্র। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সাহিত্যচর্চার ফসল প্রতিবছর নিয়মিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় অয়নের পৃষ্ঠায়। হয়তো সকলের লেখা মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করে না, তাদের উৎকর্ষের জন্য আরো অনুশীলন প্রয়োজন এবং প্রচেষ্টা সৎ হলে একসময় নিশ্চয়ই সিদ্ধি ঘটবে। অয়নের সংকলন সকল ছাত্রছাত্রীর সেই প্রচেষ্টায় অনুপ্রেরণা হয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner

২০১৫

আমরা শোকসন্তপ্ত

- যশোধরা বাগচী (সমাজসেবী, শিক্ষবিদ)
- সুবাস ঘিসিং (রাজনীতিবিদ)
- অনিল সরকার (রাজনীতিবিদ)
- কুশল দত্ত (একটি দৈনিক পত্রিকার কর্ণধার)
- অঙ্কিত কেশরী (উদীয়মান ক্রিকেটার)
- গুন্টার গ্রাস (নোবেল জয়ী জার্মান সাহিত্যিক)
- রিচি বেনো (ক্রিকেট জগতের ব্যক্তিত্ব)
- অশোক সুব্রষণ্যেম (মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব)
- মঞ্জু গোপাল মুখোপাধ্যায় (বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক)
- অমিতাভ চৌধুরী (রবীন্দ্র গবেষক ও ছড়াকার)
- মনোরঞ্জন ভক্ত (রাজনীতিবিদ)
- চার্লস কোরিয়া (স্থাপত্যবিদ)
- বিজয়া রায় (সত্যজিৎ পত্নী)
- সিস্টার নির্মলা (মিশনারিজ অব চ্যারিটির প্রধান সিস্টার)
- জেমস হর্নার (টাইটানিক খ্যাত অস্কারজয়ী পুরস্কার)
- রুচিরা শ্যাম (সাংবাদিক, সমাজকর্মী)
- অনিল মুখার্জী (কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান)
- এ পি জে আবদুল কালাম (ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি)
- সুনীল দাস (চিত্রকর)
- ভগবতী প্রসাদ ব্যানার্জী (প্রাক্তন হাইকোর্টের প্রধান বিচার পতি)
- সাধন গুপ্ত (রাজনীতিবিদ)
- প্রশান্ত সিংহ (প্রাক্তন ফুটবলার)
- পীযুষ গঙ্গোপাধ্যায় (অভিনেতা)
- হাসিম আবদুল হালিম (পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার প্রাক্তন স্পীকার)
- রবীন্দ্র জৈন (সুরসাধক)
- বাদল বসু (প্রকাশক)
- উৎপল কুমার বসু (কবি)

Scanned with CamScanner

আমরা সহমর্মী

- রায়বেরিলীতে জনতা এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত, মৃত ৩৮
- ভূমিকম্পে লণ্ডভণ্ড নেপাল, মৃত ৫০০০ এর বেশি
- বেলুড়ে মাঝগঙ্গায় বাজ, মৃত ৩
- দাবদাহে বাংলায় মৃত ১৪
- পাহাড়ে ভয়াল ধস, মৃত ৩০
- বীরভূমে বন্যার জলে ভেসে গেল বেশ কয়েকজন।
- মক্কায় আল হারামে ক্রেন দুর্ঘটনায় ২ ভারতীয়সহ মৃত ২০৭
- হিন্দুকুশে ভয়ংকর ভূকম্প। মৃত ১৫০
- প্যারিসে বিস্ফোরণের রক্তগঙ্গা, হত প্রায় ২০০

আমরা গর্বিত

- শশীকাপুরকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার।
- আই সি এস ই-তে প্রথম সৌগত চৌধুরী।
- আই এস সি-তে প্রথম অর্ক চ্যাটার্জী
- সি.এ.বি. র শীর্ষে সৌরভ গাঙ্গুলী
- বিশ্ব জিমন্যাষ্টিক চ্যাম্পিয়ন শিপে দীপা কর্মকার।

অধ্যক্ষ, অধ্যাপক মন্ডলী ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

অধ্যক্ষ

ড. শ্যামল কুমার মন্ডল, এম.কম,এম.ফিল,পি.এইচ.ডি (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)

বাংলা বিভাগ :

১। **সাধন কুমার দাস**, এম.এ., (বিভাগীয় প্রধান)
২। **ড. সুনীল কুমার দে**, এম.এ., পি.এইচ.ডি
৩। **ড. রাজন গঙ্গোপাধ্যায়**, এম.এ., পি.এইচ.ডি
৪। **অরূপ কুমার ভট্টাচার্য**, এম.এ.বি-এড (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)

Scanned with CamScanner

৫। একলাচ মন্ডল, এম.এ., বি.এড, এম.ফিল (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)

৬। মাসুদ রানা, এম.এ. (অতিথি-অধ্যাপক)

ইংরেজি বিভাগ :

১। অন্তরা সাহা, এম.এ (চুক্তিভিত্তিক অধ্যাপিকা) (বিভাগীয় প্রধান)

২। মহঃ আরিফ নাদিম, এম.এ, বি.এড (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)

৩। মাবুদুল ইসলাম, এম.এ, বি.এড. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)

৪। মঞ্জুর ইলাহি, এম, এ. (অতিথি অধ্যাপক)

৫। মহঃ তোফিজ্জুল ইসলাম, এম, এ. (অতিথি অধ্যাপক)

৬। প্রতাপ চন্দ্র মন্ডল, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)

ইতিহাস বিভাগ :

১। মহঃ সাবলুল হক, এম.এ., বি.এড. (বিভাগীয় প্রধান)।

২। শৈলেশচন্দ্র রায়, এম.এ., বি.এড. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)

৩। মহঃ নাজমুল্লা, এম.এ., (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)

৪। মসিউর রহমান, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)

৫। রফিকুল ইসলাম,এম.এ, এম.এড. (অতিথি অধ্যাপক)

দর্শন বিভাগ :

১। চন্দ্রশেখর মন্ডল, এম.এ., বি.এড. (বিভাগীয় প্রধান)

২। সুমন্ত ঘোষবাগ, এম.এ., বি.এড. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)

৩। সঞ্জয় পাল, এম.এ.(আংশিক সময়ের অধ্যাপক)

৪। নন্দিতা সরকার (মন্ডল), এম.এ., বি.এড. (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)

৫। লাল খান, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)

৬। সুধন দাস, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)

৭। সুমন ব্যানার্জী, এম.এ. (অতিথি অধ্যাপক)

সংস্কৃত বিভাগ :

১। সুজয় কুমার পাল, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)

২। মীনাক্ষী লাহা, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)

অর্থনীতি বিভাগ :

১। গোপাল চন্দ্র রায়, এম. এ.

২। ড.সম্প্রীতি বিশ্বাস, এম.এ., পি.এইচ.ডি

Scanned with CamScanner

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ :

১। কৃষ্ণা রায়, এম.এ., এম. ফিল (বিভাগীয় প্রধান)

২। শিঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী, এম.এ

৩। পম্পা ব্যানার্জী, এম.এ., বি.এড (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)

৪। নসরৎ বেগম, এম.এ.,(আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)

৫। সালাউদ্দিন সেখ, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)

৬। মরিয়ম রেজা, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ :

১। বিনায়ক চন্দ, এম.এ. (বিভাগীয় প্রধান)

২। অমর মন্ডল, এম.এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)

৩। সনাতন সরকার, এম. এ. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)

৪। দেবাশিস মন্ডল, এম.এ., বি.এড (অতিথি অধ্যাপক)

৫। অমৃতা দাস, এম.এ., বি.এড (অতিথি অধ্যাপিকা)

৬। শুভঙ্কর পানিগ্রাহী, এম.এ., বি.এড (অতিথি অধ্যাপক)

বাণিজ্য বিভাগ :

১। সি.এ নিখিলেন্দু বিকাশ দাস, এম.কম., এম.ফিল, এল.এল. বি

২। ড. শ্যামল কুমার মন্ডল, এম.কম., এম.ফিল, পি.এইচ.ডি

৩। মাধব কুমার বিশ্বাস, এম.কম

৪। সুখেন মন্ডল, এম.কম. (অতিথি অধ্যাপক)

৫। তোফাজ্জেল আহমেদ, এম.এ., এল.এল.বি., এল.এল.এম (অতিথি অধ্যাপক)

Scanned with CamScanner

পরিবেশ বিদ্যা বিভাগ :

১। হাসনারা খাতুন, এম.এস.সি (আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা)

শারীর শিক্ষা :

১। হুমায়ুন কবীর, এম.পি.ই (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)

২। মনোরঞ্জন প্রামানিক, এম.পি.এড (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)

রসায়ন বিভাগ :

১। ড. তপন কুমার কর্মকার, এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি (প্রথমার্ধ থাকার পর অবসর)

২। সুমিত সিংহ- এম.এস.সি. (অতিথি অধ্যাপক)

৩। রাজিয়া সুলতানা, এম.এস.সি. (অতিথি অধ্যাপিকা)

পদার্থবিদ্যা বিভাগ :

১। নিশিকান্ত পাল, এম.এস.সি (প্রথমার্ধ থাকার পর অবসর)

গণিত বিভাগ :

১। প্রাণকৃষ্ণ দাস, এম.এস.সি., বি.এড. (আংশিক সময়ের অধ্যাপক)

২। বেগম সামসুন্নেহার, এম.এস.সি. (অতিথি অধ্যাপিকা)

উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ :

১। সুচন্দা চক্রবর্ত্তী, এম.এস.সি (অতিথি অধ্যাপিকা)

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ :

১। শম্পা বাগ, এম.এস.সি (বিভাগীয় প্রধান)

২। সৌমী ঘোষ চৌধুরী, এম.এস.সি (অতিথি অধ্যাপিকা)

ভূগোল বিভাগ :

১। শুভময় কুন্ডু, এম.এ. বি.এড (অতিথি অধ্যাপক)

২। কৌশিক বারিক, এম.এ (অতিথি অধ্যাপক)

আরবী বিভাগ :

১। আবু সালেম, (অতিথি অধ্যাপক)

Scanned with CamScanner

গ্রন্থাগার

১। মহঃ নুরুল ইসলাম, এম.কম., এম.লিব (গ্রন্থাগারিক)
৩। সুদীপ্ত দাস, বি.এ., ক্যাজুয়াল কর্মী
৪। স্বাধীন রজক, বি.কম (সহায়ক)
৫। দীপ বিশ্বাস, মাধ্যমিক (সহায়ক), ক্যাজুয়াল কর্মী

কার্য্যলয় বিভাগ

১। মহঃ হরোজ আলি, বি.এ. অনার্স. (কোষাধ্যক্ষ)
২। ধ্রুবকুমার বারিক, এইচ.এস. (অফিস সহায়ক)
৩। অশোক কুমার রায়, অষ্টম মান, (অফিস সহায়ক)
৪। নন্দ কিশোর সিং, অষ্টম মান, (প্রহরী)
৫। অধীন রজক, অষ্টম মান, (প্রহরী)
৬। মইদুল ইসলাম, বি.এ (ইলেকট্রিশিয়ান কাম কেয়ারটেকার)
৭। মজিবুর রহমান, বি.কম. (করণিক), ক্যাজুয়ালী কর্মী
৮। আনোয়ার হোসেন, বি.কম., অনার্স., পি.জি.ডি., বি.এম, ক্যাজুয়ালী কর্মী
৯। রমানাথ দেব (আংশিক সময়), ক্যাজুয়ালী কর্মী
১০। সুজিত জমাদার, অষ্টম মান, (সাফাই কর্মী), ক্যাজুয়ালী কর্মী
১১। খালেক হোসেন, এস.এফ., ক্যাজুয়ালী কর্মী
১২। সীতা সিংহ, মাধ্যমিক-লেডি আঃ (ক্যাজুয়ালী কর্মী)

ছাত্রাবাস

১। অনুপ কুমার সিংহ, সহকারী পাচক
২। প্রশান্ত দে, সহকারী পাচক
৩। মহঃ মন্টু সেখ, সহকারী পাচক

নিরাপত্তা রক্ষী

১। সিঠুন ঘোষ, বি.এস.সি নন-মেডিক্যাল
২। বাপী ঘোষ, অষ্টম শ্রেণী

Scanned with CamScanner

জিমখানা

১। গৌতম পাল, এইচ.এস. (প্রশিক্ষক, আংশিক সময়ের জন্য)

D.N. College Computer Centre

(Affiliated by : W.B. State Council of Technical Education. Govt. of India)

: Sponsored by :

G.D. Charitable Society

Aurangabad, Murshidabad.

1. **Supriya Sengupta** (Faculty in-charge)
2. **Somnath Guha-**(Lab Asistant)
3. **Raju Barman-**(Lab Asistant)

ডি.এন.কলেজ স্বাস্থ্যকেন্দ্র

ডাঃ রাজেশ খান্না, ডি.এইচ., এম.এস. (ক্যাল)

Scanned with CamScanner

পত্রিকা সম্পাদকের কলম থেকে

আজ একটি প্রশ্ন খুব বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে—বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্য পাঠের প্রবণতা কি এই প্রজন্মের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে? সাহিত্য চর্চা কি অঙ্গুলীমেয়* কিছু বিশেষ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে ? ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকাগুলি এমনিতেই অবলুপ্তির পথে, স্ফুলিঙ্গের মতো যা জ্বলে উঠেই হারিয়ে যাচ্ছে ! প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকাগুলিও আর কজন ছাত্রছাত্রী বাজার থেকে কিনে পড়ছে?

অর্থাভাব কোনো কারণ নয়। কেন না, এই প্রজন্ম দামী মোবাইলের পেছনের যত খরচ করে, তার পাঁচ শতাংশও বই বা পত্রপত্রিকা খাতে খরচ করে না। এই ফেসবুক, ই-মেল, হোয়াটস অ্যাপের যুগে প্রকাশনা সংস্থার বাজার সত্যিই মন্দা।

এককালের অচেনা পৃথিবী আজ প্রযুক্তির কল্যাণে 'ভুবন গ্রাম'-এ পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের সঙ্গে দ্রুত সংযোগ, সস্তা বিনোদন, আর এই পথ ধরেই বিকৃত রুচির কিছু চটকদারি উপকরণ আজ অতি সহজেই আমাদের হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। বয়ঃসন্ধির সংকটকালে সেই হালকা স্থূল জগতের অশুভ হাতছানি নয়া প্রজন্মকে অতি সহজেই বেপথু করে তুলছে।

সুস্থ সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায়, আমাদের চারপাশে তার চর্চা কমে আসছে। দূরদর্শণের বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলে যেভাবে অপসংস্কৃতির ঘোলা জল ঢুকে পড়ছে, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের উগ্রতা যেভাবে চাপ ফেলছে কৈশোরের সবুজ প্রান্তরে, তাতে সত্যিই পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে গেলে হয়তো আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যকে খুঁজে পাবো, কিন্তু এই উন্নত প্রযুক্তির সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। কাজেই তথাকথিত প্রগতির অংশীদার হতে গেলে কিছু অনিবার্য হলাহল পানও করতে হবে। এখন এসবের মধ্যেই এসব নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে আর বাঁচার রসদও খুঁজে নিতে হবে। নইলে এমন একদিন আসবে, যেদিন হয়তো আমরা থাকবো কিন্তু আমাদের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি—সবকিছুই কোনো আর্কাইভে গিয়ে ঠাঁই পাবে। আর এই কাজটা শুরু হবে স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে।

অবশ্য তারও আগে, প্রত্যেকটি শিশুর প্রথম পাঠ শুরু হয়ে যায় বাড়িতে, তার বাবা-মায়ের সান্নিধ্যে। পরিবার হচ্ছে প্রথম পাঠশালা। কাজেই শিশুর জীবনগঠনের ব্যাপারে বাবা-মা অর্থাৎ অভিভাবককে সবার আগে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। উর্বর

Scanned with CamScanner

মাটি থেকে একটি শিশু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এলে শিক্ষকের পক্ষে তাকে গড়ে তোলা সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু সমাজ-কাঠামোকে তো সহজ একদিনে বদলাতে পারবো না। এই এলাকার বিস্তীর্ণ দরিদ্র জনবসতি বিড়ি শিল্পের উপর নির্ভরশীল। এমন কি কলেজ পড়ুয়া অনেক ছাত্রছাত্রীও এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। কাজেই একদিকে লেখাপড়া অন্যদিকে রুজি-রোজগার—ছাত্রজীবনেই এই দ্বৈত ভূমিকা অনেক ছাত্রছাত্রীকেই পালন করতে হয়। ফলে তাদের শৈশব এবং কৈশোর যেভাবে অতিবাহিত হওয়া উচিত, যেভাবে তাদের মনের বিকাশ ঘটা উচিত, তেমনটি হয়ে উঠছে না। তাছাড়া অনেক অভিভাবকের মধ্যে লেখাপড়া না-জানার জন্য সচেতনতার অভাবও রয়েছে। ফলে তারা যখন কলেজে এসে ভর্তি হয়, তখন তাদের মনের বয়সোচিত পরিপুষ্টি থাকে না এবং সংস্কৃতিবোধের যথেষ্ট অভাবও লক্ষ্য করা যায়।

তাদের মধ্যে যারা একটু ব্যতিক্রমী, তাদের ইচ্ছে থাকে, তাদের নিজেদের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখবার। তারা গল্প-কবিতা লেখার চেষ্টাও করে, সেটা আমরা বুঝতে পারি অনেকের মধ্যে লেখা জমা দেবার অদম্য উৎসাহ দেখে। কিন্তু সেই সমস্ত লেখার অধিকাংশই সাহিত্যের গুণগত বিচারে উত্তীর্ণ হতে পারে না, ফলে বাধ্য হয়ে সেগুলিকে বাতিল করতে হয়।

আমি লেখালেখিতে উৎসাহী ছাত্রছাত্রীদের বলব, তোমরা আরো বেশি করে সমসাময়িক পত্র পত্রিকা পড়ো। আজকের ছোটগল্প কোন্ খাতে বইছে, কবিতার অভিনব আঙ্গিক কীভাবে গড়ে উঠছে, কীভাবে বদলে যাচ্ছে রচনার বিষয়গত রং, তা নিজে পড়ে না বুঝলে শুধুমাত্র তত্ত্বকথায় কোনো কাজ হবে না। বর্তমান লেখালেখির গতি প্রকৃতি সর্ম্পকে সম্যক ভাবে ওয়াকিবহাল থাকলে, নিজের লেখার একটা মোটামুটি মূল্যায়ন নিজেই করা যায়। আর বর্তমান সাহিত্যচর্চার খোঁজখবর না রাখলে একজন ছাত্র বা ছাত্রী তার লেখার ভালোমন্দ সর্ম্পকে কোনো ধারণাই করতে পারবে না এবং রচনাটি কেন বাতিল করা হয়েছে, তাই নিয়ে নির্বাচকদের উপর কিছু অহেতুক ক্ষোভ থেকে যাবে।

শুধু অয়নের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে লেখা নয়, সারাবছর ধারাবাহিকভাবে পড়াশোনার পাশাপাশি এই চর্চা চালিয়ে যেতে হবে। আমার মনের কথা সবার কাছে মনোগ্রাহী করে তোলাটাও একটা বিশেষ Art এবং একটা বিশেষ ক্ষমতা। এই ক্ষমতা অনুশীলনের দ্বারা অর্জন করতে হয় এবং এই অনুশীলন একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া।

Scanned with CamScanner

অয়নের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত হোক—
এই শুভ কামনা সকলের জন্য।

—সম্পাদক।

কলেজ পরিচালন সমিতি

২০১৫-২০১৬

সভাপতি :		মুস্তাক হোসেন
সম্পাদক :		ড.শ্যামল কুমার মন্ডল
সদস্য (ডি.পি. আই প্রতিনিধি) :		ইমানি বিশ্বাস
সদস্য (বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি) :	(১)	ড. আবু এল শোকরানা মন্ডল
	(২)	দিলরুবা খাতুন
সদস্য (সভাপতি, পঞ্চায়েত সমতি, সুতি) :		আনিকুল ইসলাম
সদস্য (দাতা প্রতিনিধি) :	(১)	অমীমাংসিত
	(২)	অমীমাংসিত
সদস্য (শিক্ষক প্রতিনিধি) :	(১)	নিশিকান্ত পাল
	(২)	সাধন কুমার দাস
	(৩)	ড. সুনীল কুমার দে
	(৪)	মাধব কুমার বিশ্বাস
সদস্য (শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি) :	(১)	মোঃ হরোজ আলি
	(২)	ধ্রুবকুমার বারিক
সদস্য (ছাত্র প্রতিনিধি) :		খালেক হোসেন

Scanned with CamScanner

'মনে'র কান্ড কারখানা

—**মল্লিকা সিংহ**, বি.এ.তৃতীয় বর্ষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ)

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অলংকারে সজ্জিত মানুষের মন। মানব-মন এমনই এক জগৎ, যাকে নির্দিষ্ট ভাবে ধরে রাখা ছটফটে একটা শিশুর মতোই কষ্টকর। মনুষ্য জীবনে সৃষ্টির আদি কাল থেকেই মানুষের শরীরটা মনের দাসত্ব পালন করে আসছে। মন নিজের শান্তির জন্য শরীরটাকে যন্ত্রের ন্যায় চালনা করে। প্রকৃত পক্ষে মন ব্যাতীত শরীর এক যান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপ ছাড়া আর কী? ভাবতে অবাক লাগবে হয়তো শরীর নামক প্রাণহীন নিশ্চল জড় পদার্থের কোনো ভিত্তি থাকবে না, যদি-না সে মনের অধীনত্ব স্বীকার করে। প্রশ্ন যদি ওঠে মন কী ? What is mind ? বৈজ্ঞানিক মতে মন বলতে বোঝায় Brain বা মস্তিকে। মস্তিষ্কের সমগ্র কার্য প্রণালী-কেই মনের রূপ ধরা হয়। যা আমাদের ভালো মন্দ বিচার বোধ জাগায় ও চিন্তা করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। মনে করতে ও চিনতে শেখায় কোনো বিষয় বস্তুকে। কিন্তু মনো বৈজ্ঞানিকের মতে মন বলতে বোঝায় Feelings বা অনুভূতিকে। যা আমরা বিভিন্ন নার্ভ এর মাধ্যমে সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ করি। এক্ষেত্রে চিন্তা করার অনুভূতি আমরা Human Consciousness বা মানব সচেতনতা থেকে লাভ করি। যাই হোক Brain ও Mind উভয়ই একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটা বলা যেতেই পারে।

মানুষের জীবন এতটাই সুস্বাদু যে তার আস্বাদন থেকে সহজে কেউ মুক্ত হতে চায় না । মনুষ্য জীবন কামনা-বাসনা-স্বার্থ ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। আর এই সব কিছুর উর্দ্ধে আছে মানুষের চাহিদা। চাহিদাই মানুষের সুখ-দুঃখের কারণ; চাহিদার পরিপূর্তি মানে সুখ বা শান্তি ও চাহিদার ব্যর্থতা মানে—দুঃখ বা হতাশা। সুখ মুহূর্তকে আনন্দমুখর করে তোলে; অনুভূতিকে তৃপ্ত করে। আর দুঃখ এনে দেয় অনুভূতি মূলক যন্ত্রণা, যা মানুষকে দিনের পর দিন অসহ্য করে তোলে। যদি কোনো আঘাত

Scanned with CamScanner

মনে গভীর রেখাপাত করে বা কোনো অতৃপ্ত চাহিদা মনের কোনো কোণে ঠেসে রাখা হয়; সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তা আকাশের মেঘের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে হঠাৎ একদিন গর্জন করে উঠে, অঝোরে ঝরে পড়ে ব্যক্তি তথা পরিবারের উপর। যা মানসিক যন্ত্রণাকে আরও তীক্ষ্ণ করে তোলে। গবেষণায় প্রমাণিত অতৃপ্ত আশা বা প্রত্যাশার সৃষ্টি হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শৈশব থেকে বাল্য স্তরের মধ্যে। যা বিস্ফোরক আকার ধারণ করে কৈশোর প্রাপ্ত বয়সে। এমনকি বৃদ্ধ বয়েসেও দেখা গেছে। শিশু তার প্রত্যাশিত চাহিদাকে অবদমন করার জন্য বিভিন্ন বিকৃতিমূলক আচরণ করে থাকে।

অসুস্থ শরীর নিয়ে বেঁচে থাকা যতটা কষ্টকর তার থেকে অনেকগুণ বেশি কষ্টকর হয় অসুস্থ মন নিয়ে বেঁচে থাকা। অসুস্থ মস্তিষ্ক মানুষকে উদ্বিগ্ন ও নিশ্চল করে দিতে পারে। শরীর অসুস্থ হলে বা সামান্য চোট লাগা থেকে অস্ত্রোপাচার পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই আমরা ডাক্তারের শরণাপন্ন হই। ডাক্তারকে আমরা ভগবানের অনন্যক রূপ হিসাবে ভাবি। কিন্তু যদি আমাদের 'মন' খারাপ হয়, তাহলে আমরা একাকী চুপটি করে নির্জনে বসে থাকি; পাছে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে বসে।। এই ভাবে মানুষ নীরবী রয়ে নিজের দুঃশ্চিন্তা বা দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করে। আবার সহ্য করাই হল দুঃখ-যন্ত্রণা নিরসনের একমাত্র উপায় এই ভেবেও মানুষ চুপ থাকে। নীরব থেকেও বা সহ্য করেও যখন ব্যাক্তি মানসিক শান্তি না পায় তখন সে নিজের ভাগ্যকে দায়ী মনে করে ভগবানের বা আল্লাহের দরবারে হাজির হয়। এর মধ্যেই দুশ্চিন্তা ব্যাক্তিকে অনেকটা গ্রাস করে ফেলে। ক্রমশঃ সেই ব্যাক্তি হতাশায় ভুগতে থাকে বা অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ফলে ব্যাক্তি মন-মরা হয়ে সর্বদা বোঝার মতো বসে থাকে, কারোর সাথে কথা বলে না, অযথা ভয় করে, একই কথা বার-বার বলে বা একই কাজ বার-বার করে, অলীক বা ভ্রাম্যমান চিন্তা মাথার মধ্যে ঘোরে। অনেক সময় নিজের আপনজনকেও চিনতে পারে না—সাধারণ ভাবে এদের পাগল বলে অনেকে ধারণা করে। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। এরা এক ধরণের রোগী অর্থাৎ মানসিক রোগী। মানসিক রোগের বিভিন্ন কারণ আছে। গবেষণায় দেখা গেছে ভবিষ্যতে এই মানসিক ব্যাধি আমাদের এই ভূ-স্বর্গে মহামারীর আকার ধারণ করতে পারে।

Scanned with CamScanner

মুক্তি পেতে হলে চুপ করে বসে না থেকে বা ঈশ্বরের দরজায় না দাঁড়িয়ে কোনো অভিজ্ঞ ব্যাক্তির পরামর্শ গ্রহণ করা দরকার। প্রয়োজনে কোনো (Psychological Counsellor বা Psychologist) সাইকোলজিক্যাল কাউনসেলর বা সাইকোলজিষ্ট এর শরণাপন্ন হওয়া দরকার। গুরুতর ক্ষেত্রে (Psychiatrist) সাইকিয়াট্রিস্ এর শরণাপন্ন হতে হবে।

একটুতেই রেগে যাওয়া, নিজের প্রতি ঘৃণা, বার-বার বিকৃতিমূলক আচরণ বা বদ অভ্যাস, মনোযোগের অভাব, অযথা ভয়, আত্ম বিশ্বাসের অভাব, মৃত্যুচিন্তা, অনৈতিক কর্মে আগ্রহ, দাম্পত্য জীবনের জটিলতা বা পারিবারিক অশান্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কোনো ভালো Counsellor বা Psychologist এর কাছে নিজের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা শেয়ার করতে পারবেন, তিনি একজন ডাক্তার হিসাবে আপনার সমস্যার সমাধান করবেন।

..End..

Scanned with CamScanner

মা

—ফিটু সেখ
বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ (শিক্ষাবিজ্ঞান অনার্স)

মা নামে যে আছে সুধা
মিটায় সকল তৃষ্ণা ক্ষুধা
আপন জনের হাজার ভিড়ে
মার মত আর কেউ নাইরে
তাইতো শিশু জন্মের পরে
'মা' বলে ডাকে সবার আগে।

স্নেহ মায়া মমতা ভরা,
করুণাময়ী মা যে সদা
মাগো তোমার চরণ জুড়ে
রেখো মোরে জনম ভরে
ধন্য আমার মানব জীবন
গর্ভে তোমার জন্ম নিয়ে।

যখন আমি ছিলাম কোলে
কত ব্যাথা সহ্য করে
মা করেছেন লালন পালন
সুখ আহ্লাদ সব ত্যাগ করে।

মা হল অমূল্য রতন
কর সবে মায়ের যতন
মায়ের আঁচল তলে শান্তি মিলে
পাবে না আর কোথাও গেলে।

Scanned with CamScanner

ধর্মান্ধদের কারাগারে
মা মা বলে ডাকছিস কারে
'মন্দির মসজিদ খুঁজছিস যারে
তিনি আছেন নিজ নিজ ঘরে।

চেয়ে দেখ তোর চোখের পানে
দুহাত তুলে সর্বক্ষণে
মঙ্গল কামনা করছেরে তোর
নিঃস্বার্থ হযে জীবনে।

আর সেই জীবন কালের শেষ বিকালে
আপন জনের অন্তরালে
রাখছো তোমরা সেই মাকে
বৃদ্ধাশ্রমের চার দেওয়ালে।
মাকে যারা রাখছো দূরে,
বুঝবে তোমরা বৃদ্ধ হলে,
তোমাদেরও সন্তানরা,
পাঠাবে তোমায় বৃদ্ধাশ্রমে।

দেখবে সেদিন কেমন জ্বালা
সন্তান ছেড়ে দুরে থাকা,
ভাবতে ভাবতে দিন কেটে যায়।
কেন পাঠিয়ে ছিলাম মোর মাকে তাই।
তাইতো বলি বন্ধুরা শোন
মায়ের অবহেলা করিও না কখন
জীবনে চলার পথে
মায়ের আশিস সঙ্গে নিয়ো।।

Scanned with CamScanner

সাগর

—সুস্মিতা কর্মকার
বি.এ. তৃতীয় বর্ষ (শিক্ষাবিজ্ঞান অনার্স)

এ তুমি কেমন তুমি
দেখাও খালি নৃত্য,
এ তুমি কোন খেয়ালে
বাজাও জল বাদ্য,
নৃত্য তোমার দোদুল দোলা
চপল তোমার চলা,
সারা জীবন এমনই ভাবে
জলেই মাতোয়ারা।
এ তুমি কেমন তুমি
এমন তোমার রূপ,
এ তুমি কোন খেয়ালে
রাঙা ও ধরা-র বুক।
তোমার পরে শূন্য গগন
শূন্য জল ধারা,
তোমার পরে উঠল মালা
মনি, মুক্তা ভরা।
এ তুমি কেমন তুমি
তোমার এত ঝঙ্কার,
এ তুমি কোন খেয়ালে
সাজাও তোমার সংসার।

Scanned with CamScanner

তোমার এই ঝঙ্কারেতে
চমকে ওঠে ধরা।
তুমি শুধু উথাল পাতাল
এই তো পরম্পরা।।

ভালোবাসার সংকট

—আজহারুদ্দিন
বি.এস.সি দ্বিতীয় বর্ষ

সেই কবে ভুল বুঝে চলে গেছো দূরে
দূরে বহু দূরে
তবুও খুঁজে যাই
গভীর রাতে স্বপ্নের মধ্যে।
নির্জনতার দুপুরে।
পড়ন্ত বিকেলের ছায়ায়
সুগন্ধি ফুলের গন্ধে।
সন্ধ্যায় সূর্যটা যখন ডিমের
লাল কুসুমের মতন আস্তে আস্তে
চোখের আড়ালে হয়,
ক্লান্ত পাখির বাসা ফেরার শব্দে
তোমাকে খুঁজি।
এক আকাশ অশ্রু নিয়ে
বেঁচে আছি স্বপ্নের নীল পাহাড়ে।

Scanned with CamScanner

নীল খাম

—টুম্পা খাতুন
বি.এস.সি, দ্বিতীয় বর্ষ

ভালোবাসার বৃষ্টিতে ধোয়া নীল খাম
আজ চিঠির ফাইলে আবদ্ধ
বহুদিন থেকে বন্দী।
চিঠি নেই, খাম আছে
ভালোবাসা নেই, মানুষ আছে
সুখ নেই, সংসার আছে।।
ভিখারী মন, ভালো বাসা চেয়ে ফেরে একা
নীল খামের মতো।

আমরা ও তোমরা

—সুকিত সিংহ
বি.এ, প্রথম বর্ষ

তোমরা ও আমরা বিভিন্ন। কারণ তোমরা তোমরা, এবং আমরা আমরা। তা যদি না হত তা হলে ইউরোপ ও এশিয়া এ দুই হত না-এক হত আমি ও তুমির প্রভেদ থাকত না। আমরা ও তোমরা উভয়ের মিলে হয় শুধু আমরা হতাম, না হয় শুধু তোমরা হতে।

আমরা পূর্ব, তোমরা পশ্চিম। আমরা আরম্ভ তোমরা শেষ। আমাদের দেশ মানব সভ্যতার সূতিকা গৃহ, তোমাদের দেশ মানব সভ্যতার শ্মশান।

আমরা ঊষা তোমরা গোধূলি আমাদের অন্ধকার হতে উদয়, তোমাদের অন্ধকারের ভিতর বিলয়।

Scanned with CamScanner

আমাদের রং কালো, তোমাদের রং সাদা।
আমাদের বসন সাদা, তোমাদের বসন কালো।
তোমরা শ্বেতাঙ্গ ঢেকে রাখো, আমরা কৃষ্ণ দেহ
খুলি রাখি। আমরা খাই সাদা জল, তোমরা খাও লাল পানি।
আমাদের আকাশ আগুন তোমাদের আকাশ ধোয়া।
নীল তোমাদের স্ত্রীলোকের চোখে, সোনা তোমাদের স্ত্রীলোকের মাথায়।
নীল আমাদের শূন্যে, সোনা আমাদের মাটির নীচে।
তোমাদের আমাদের অনেক বর্ণভেদ ভুলে যেন না যাই তোমাদের
দেশের মধ্যে কালাপানির ব্যবধান।
কালাপানি পার হলে আমাদের জাত যায় না, হলে তোমাদের
জাত থাকে না।

ছুটির রূপ কথা

—গিয়াসুদ্দিন সেখ
বি.এ, দ্বিতীয় বর্ষ (ইতিহাস অনার্স)

আজ সারাদিন খেলাধুলা
আজ সারাদিন ছুটি।
আজ সারাদিন ঘাসের উপর
করব লুটোপুটি ।।
বন্ধু হব সবুজ পাতার
নদীর জলে কাটব সাঁতার

Scanned with CamScanner

বিকেল বেলা খোলা মাঠে
হাওয়া খাব নদীর ঘাটে
হয়তো আবার নাইতে যাব
নদীর স্রোতের জলে,
কাশের বনে আজ সারাদিন
করব ছুটোছুটি।।
আজ সারাদিন পাখির খোঁজে
ঘুরব বনে বনে।
দোয়েল শ্যামা ময়না-টিয়া
হব মনে মনে।।
পাখির মতো উড়তে উড়তে
আকাশ ছুঁবো ঘুরতে ঘুরতে
দুর পাহাড়ে ছুটে যাবে
হরিণ ছানা দুটি।
আজ সারাদিন ছুটি আমার
আজ সারাদিন ছুটি।।

Scanned with CamScanner

ইঁদুর ও হাতি

—করবী সরকার
বি.এ, প্রথম বর্ষ (সংস্কৃত অনার্স)

নদীর জলে গা ডুবিয়ে,
স্নান করছে হাতি।
হঠাৎ করে দৌড়ে এলো,
ছোট্টো ইঁদুর সাথি।
বলল ডেকে জলে থেকে,
ডাঙায় উঠে দাঁড়া।
হাতি বলল কী হয়েছে?
কীসের এত তাড়া ?
ইঁদুর বলল পঞ্জাবিটা
ঘরে কোথাও নাই।
মনের ভুলে পরিস যদি,
দেখতে এলাম তাই।

Scanned with CamScanner

কুসংস্কার

—গৌরব সিংহ
বি.এ, প্রথম বর্ষ (ইংরেজী অনার্স)

ব্যাঙ ডাকলে বৃষ্টি আসে,
মোরগ ডাকলে ভোর;
কুকুর ডাকলে লেজ গুটিয়ে,
ছিটকে পালায় চোর।
পেঁচা ডাকলে অশুভ হয়,
শকুন ডাকলে মরণ;
হঠাৎ কোনো বিপদ নাকি,
কাকের ডাকার কারণ।
পাখি ডাকলে কুটুম আসে,
মিষ্টি হাতে নিয়ে;
বৃষ্টি মাঝে রোদ হাসলে,
শেয়াল মামার বিয়ে।
সত্য-মিথ্যা যাচাই করি,
টিকটিকির টিক ডাকে,
বউ পাগল হয় সেই ছেলেটির,
ঘাম থাকে যার নাকে।
হঠাৎ করে চোখ কাঁপলে,
দুঃখ আসে বটে;
বসা নাকি অশুভ হয়,
ঘরেরই ওই চৌকাটে।

Scanned with CamScanner

যাত্রা নাকি অশুভ হয়,
দেখলে কলস পথে;
কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আসে,
চুলকালে ডান হাতে।
ভাঙা আয়নায় মুখ দেখা,
বড়োদের মানা;
কুসংস্কারে আজও আমরা,
চোখ থাকতে কানা।

এই পৃথিবী

—ইসমোতারা বেগম
বি.এ, দ্বিতীয় বর্ষ (বাংলা অনার্স)

মানবজীবনে শুধুই কি অন্ধকার?
কোথাও নেই আলো? শব্দহীন ভালোবাসার আকাশ?
চারদিকে শুধু কোলাহল,
শোষণ, বঞ্চনা, হিংসা আর রক্তপাত !
হিংস্র জলচর প্রাণীদের উদ্ধত আস্ফালন!
কোথাও কি নেই আদিগন্ত সবুজ অরণ্যে
থোকা থোকা ফুটে থাকা ফুল,
পাখিদের বিশুদ্ধ কাকলি ?
এত রক্তে লাল কেন নদীর প্রবাহ?
উচ্চকিত আগ্নেয়াস্ত্র এত কেন গর্জায় আকাশে?
তারাদের দেশে দেখ, কোনো শব্দ নেই,
কোনো পাপ নেই,
সীমাহীন অবারিত আনন্দনগরী।

Scanned with CamScanner

'স্বপ্ন'

—সীমা দাস
বি.এ, দ্বিতীয় বর্ষ (বাংলা অনার্স)

নিঃঝুম সেই কালো রাত্রি
জেগে ছিল না কোনো যাত্রী ।
বইছে শুধু মৃদুমন্দ বাতাস
আর শোনা যাচ্ছে বাতাসের মর্মর আভাস।
একা আমি জেগে আছি
অন্ধকার পথে দূরতর তারাদের দেশে ।
দেখছি আমি সারি সারি গাছপালা
কোথাও যে নেই, এর শেষ খেলা।
তবু বুকে সাহস নিয়ে সামনের পথে এগিয়ে যাচ্ছি।
সেই গাছপালা যেন আরো দূরে সরে যাচ্ছে!
দূর থেকে হঠাৎ কোন এক কান্নার ধ্বনি !
ভয়ে বুক কাঁপলো আমার !!
তবু আমি থেমে থাকিনি
সামনে দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।
সে কান্না কি আসলে কান্না ?
নাকি বাতাসের কোনো এক মর্মর ধ্বনি।
হঠাৎ জোরে শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল আমার।

Scanned with CamScanner

মাস্টার মশাই

—দেবারতি সিংহ রায় (বি.এ, প্রথমবর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স)

প্রতিদিনের মত আজও দেরি হয়ে গেল অশোক বাবুর। ইদানিং রোজই এমন দেরি হয়ে যায়। ছাত্র প্রীতমের বাড়ি অনেকটা দূর, হাঁটা পথ। রোজ হেঁটেই যান তিনি। টুকটুকিতে যেতে গেলে নগদ কুড়িটা টাকা দিতে ঠিক যেন বাধে অশোক বাবুর। পড়ানোর মাঝখানে রোজই ছাত্রের মা সযত্নে সুন্দর একটা কাপ-প্লেটে চা দিয়ে যায়, পাঁচটা বছর ধরে তিনি পড়ান। বড্ড নম্র, ভদ্র মহিলা তিনি। ছাত্র প্রীতম বড্ড চঞ্চল হয়ে উঠেছে । মাঝে মধ্যে পড়াতে এসে তিনি দেখেন তার পাশের চেয়ারে প্রীতম নেই, বাড়ির কাজ গুলোও ঠিকঠাক জমা দেয় না মাস্টার মশাই কে। এই নিয়ে অনেকবারই ছাত্র প্রীতমের মা তার ছেলের মাস্টার মশাই অশোক বাবুর কাছে অভিযোগ জানিয়েছে, বলেছে—'মাস্টার মশাই আপনি একটু কড়া হোন, ও দিন দিন গোল্লায় যাচ্ছে, একটু কড়া হোন।'

আজও দেরি হয়ে গেল, মিষ্টির দোকানের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবল আজও দশ মিনিট দেরি, বয়স হয়েছে, চোখের জ্যোতি কমে এসেছে, ঠিক ভাবে হাঁটতে পারে না তিনি। শিক্ষকতার কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পর অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। পেনশন নেই সঞ্চয়ও নেই, স্কুলের পক্ষ থেকে কিছু সাহায্যে আর পড়ানোর টাকাতেই দিন চলে। এক মেয়ে তারও বিয়ে হয়ে গেছে। যাই হোক এসব ভাবতে ভাবতে প্রীতমের বাড়ি পৌছে গেল অশোক বাবু। ভিতরে ঢুকতেই কিছুক্ষণ বসল। তার পর প্রতিদিনের মত ছাত্রের মা কাপ-প্লেটে চা নিয়ে টেবিলের উপর রাখলেন। অশোক বাবু বলল প্রীতম.....। প্রীতমের মা তিনটে এ-শ টাকার নোট টেবিলে রেখে বলল এই নিন আপনার এক মাসের টাকা। অশোক বাবু বললেন এইত কদিন আগে দিলে মা? প্রীতমের মা বলে উঠল, 'মাস্টার মশাই আপনার বয়স হয়েছে ও'কে সামলানো আপনার পক্ষে সম্ভব না। প্রীতমের বাবা একজন কমবয়সী মাস্টার দেখেছেন। আপনি ভুল বুঝবেন না। চা—টা খেয়ে নিন। এই বলে ভদ্র মহিলা চলে গেলেন।

Scanned with CamScanner

মাস্টার মশাই নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে রইলেন অনেক ক্ষণ। চারিদিকে তিনি তাকাচ্ছেন তাঁর ঘর, চেনা টেবিল ও বই-এর ডেক্স সবটাতে ভাল ভাবে চোখ বুলোচ্ছেন তিনি অনেকবার যেন চোখ সরছে না কোন কিছু থেকে। তিনি তাঁর চেনা চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে বললেন—"গাছ বুড়ো হয়ে গেলে কাঠ হয়, কাঠের টেবিল হয়, চেয়ার হয়, খাট হয় কিন্তু মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে....."। তিনি আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন, শুধু রয়ে গেল ঢাকা দেওয়া সুন্দর কাপে চা, আর তিনটে একশ টাকার নোট ।

হাড়কিপটে নিন্দুক

—**সুপ্রিয় ঘোষ** (বি.এ, প্রথমবর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স)

আচ্ছা দাদা এটা কোন পাড়া বলতে পারেন ? একজন লোক আরেকজনকে জিজ্ঞেস করল। 'অতুল ঘোষ সরণী' কেন বলুন তো ?

প্রথম ব্যক্তি : অতুল ঘোষ সরণীর ভেতর দিয়ে গিয়ে দয়ারাম ঘোষের মিষ্টির দোকান আছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : হ্যাঁ আছে। কিন্তু আপনি কী সেই দোকানে মিষ্টি কিনবেন নাকি? আরে একদম কিনবেন না । যত সব ভুসো মাল। পাঁচ দিনের বাসি মিষ্টি বিক্রি করে, কিন্তু মুখে বলবে একদম খাঁটি। ওদের কথায় ভুলবেন না।

প্রথম ব্যক্তি : আরে দুর ছাই আমি কী ওদের মিষ্টি খাব নাকি ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : তবে ?

প্রথম ব্যক্তি : ওদের দোকানের পাশ দিয়ে গিয়ে শ্যামবাবুর লজ, আবাসন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : হ্যাঁ ! আপনি কী সেখানে ঘর ভাড়া নেবেন নাকি? একদম নেবেন না। পনেরো বছরের পুরোনো লজ। সবাই বলে সেখানে নাকি তেনাদের বাস। দুগ্‌গা, দুগ্‌গা।

Scanned with CamScanner

প্রথম ব্যক্তি: ওরে বাবা, তেনাদের নাম শুনে বুকটা ধড়াস করে উঠল। তবে আমি ওখানে থাকতে যাব কেন বলুন তো?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : থাকবেন না ! তবে জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

প্রথম ব্যক্তি : আরে ওর পাশ দিয়ে বাঁ দিক দিয়ে গঙ্গারাম সাহার গলি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ওখানে মরতে ও যাবেন না । যত সব কুখ্যাত অপরাধীর আড্ডা ওই গলিতে। সবসময় চাকু, বন্দুক নিয়ে ঘোরে।

প্রথম ব্যক্তি : তা আমার কী ! জীবনের ভয় নেই। আমি ওখানে যাবনা।

দ্বিতীয় ব্যক্তি: যাবেন না ?

প্রথম ব্যক্তি : না যাব না। তবে ওর পাশে ঈশান কোনে গিয়ে 'খাবার দেশ' হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : তা সেখানে গিয়ে খাবেন নাকি ? যদি খান তবে বলে রাখি, ওখানে একদিন খাবেন তো বাথ্‌রুম থেকে বেরোতে পারবেন না। পেটের রোগ, আমাশয়, জন্ডিস, সব এক সঙ্গে হবে। ওদের যত সব নোংরা আঢাকা খাবার । একই ঘরে খাবার, মশা, মাছি, টিকটিকি একসাথে থাকে। ছিঃ ! ছিঃ !

প্রথম ব্যক্তি : ইস্! বমি পেয়ে যায় এসব কথা শুনে। তবে, আমি সেখানে যাব না। তার পেছন দিয়ে গিয়ে মতিলালের স্টেশনারী দোকান।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ওই দোকানে স্টেশনারী জিনিস কিনবেন? কিনবেন না। এক নম্বরের বাজে লোক। বেশি দাম নেবে, কিন্তু এক পয়াসাও ছাড় দেবে না। কথায় কথায় ঝগড়া করে ক্রেতাদের সঙ্গে।

প্রথম ব্যক্তি : ও তাই নাকি ? আপনি জানিয়ে উপকার করলেন।ওই দোকানের পাশ দিয়ে গিয়ে শিব মন্দির আছে না ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি : হ্যাঁ আছে। কিন্তু শিব দর্শণ করতে পারবেন না। পান্ডাদের ভীড় সামলাতে গিয়ে আপনাকে অক্কা পেতে হবে।

প্রথম ব্যক্তি : অক্কা পায় পাব। কিন্তু ওই মন্দিরের পাশ দিয়েই আমাকে যেতে হবে।

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয় ব্যক্তি : কেন ?

প্রথম ব্যক্তি : কারণ ওই মন্দিরের পাশ দিয়ে গিয়ে মদনমোহন চাকলাদারের দুধের দোকান।

দ্বিতীয় ব্যক্তি: ওই দুধ কখনোই খাবেন না। মিল্ক পাউডার দিয়ে বানানো দুধ। আরে ওই পঁচা দুধ বিক্রি করে লোকটা তিনতলা বাড়ি করে ফেলল। লোকটার দুধের দুর্নামও আছে কিন্তু।

প্রথম ব্যক্তি : ছোটোবেলা থেকেই আমার দুধের নামে অ্যালার্জি। দুধ আমি খাই না। আসলে ওই দোকানদারের সামনে বানীওলা।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : হ্যাঁ !

প্রথম ব্যক্তি : তার পাশ দিয়ে গিয়ে মনিমোহন সেনের বাড়ি আছে তো ? তাকে আমার চাই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : কেন বলুন তো ? মনিমোহন সেন তো আমি।

প্রথম ব্যক্তি : ও আপনি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : আপনার আবার আমার কাছে কী চাই ?

প্রথম ব্যক্তি : আজ্ঞে, আমাকে শ্যামবাজারের শরৎ দাস মানে শরৎ দা পাঠিয়েছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : ওর নাম আমার সামনে আনবেন না। বখাটে ছেলে একটা। তা ও আপনাকে পাঠিয়েছেন কেন ?

প্রথম ব্যক্তি : আসলে ঘটনাচক্রে কিছুদিন আগে ও আমাকে আপনার কথা বলে। বলে আপনি হচ্ছেন হাড়কিপ্‌টে লোক। লোকের নামে আপনি দুর্নাম করতে ওস্তাদ ।আমাকে বলে ওর কাছে গিয়ে ওকে কেউ জব্দ করতে পারেনি। যদি তুই গিয়ে ওকে একটা মোক্ষম চিমটি কাটতে পারিস তাহলেই বুঝব তোর এলেম আছে। তোকে পাঁচশ টাকা দেব। তাই আমি আপনাকে খুঁজছি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি : অ্যাঁ ! পাঁচশো দেবে বলেছে? যদি তিনশো আমাকে দেন তাহলে এই নিন, পিঠে চিমটি কেটে এক খাবলা মাংস তুলে নিন, আমার আপত্তি নেই। প্রমাণের দরকার নেই। মনিমোহনের আপত্তি নেই। প্রমানের দরকার নেই। মনিমোহনের মাংসের দুর্গন্ধ শুঁকেই শরৎ বুঝতে পারবে, মাংস জেনুইন।।

Scanned with CamScanner

সফল হল প্রেম

—দশরথ কর্মকার (প্রাক্তন ছাত্র)

সমাজের অবহেলিত খোকা
বাস শহরের আস্তাকুঁড়,
চরিত্র ভালোবাসার কাঙাল।
স্বপ্ন হল অপূর্ণ।
তাই সে ছুটছে
ছুটছে তো ছুটছেই.....
একটা সুন্দরী মেয়ে বাঁধলো তাকে,
কিন্তু হায় ! দাড়ি হল ছিন্ন।
আবার মুক্ত হল সে।

এবার আর সে ছুটছে না
কেউ বাঁধছেও না।
তার কণ্ঠস্বরও হল ক্ষীণ
হ্যাঁ আস্তে আস্তে বোবা হয়ে গেল।

এইভাবে একদিন সমাজের বুক থেকে,
দেশের বুক থেকে কোথায় যেন
হারিয়ে গেল সে,
তদন্ত করা হল
কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না।

Scanned with CamScanner

তারপর হঠাৎ একদিন খবর এল
সে নাকি আবার বাঁধা পড়েছে,
তবে মেয়েটি আদৌ সুন্দরী নয়
গায়ের রঙ মিশমিশে কালো
এতো কালো যে বোঝা যায় না
কোনটা অন্ধকার আর কোনটা সে।
মেয়েটি বোবা
কিন্তু আওয়াজ বড়োই মিষ্টি
এতো মিষ্টি যে—
সবাই শুধু একবার ডাকার অপেক্ষা রাখে
তারপর ব্যস!
প্রেমে হাবুডুবু খেতে বাধ্য।
একবার মনে হল
সেই মেয়েটার কথা
যার প্রেমে যদু, মধু ও শ্যামও পড়েছে
যতীনবাবুও পড়েছেন
এমনকী পাশের বাড়ির শুভ্রাও ।
মেয়ে, ছেলে, বুড়ো সবাই।
বুড়ো গুলো তার খুব পছন্দ,
শিশু, যুবকদের ঠকায়
আর মেয়েদের জন্য—
পুরুষের ছদ্ম নেয়।!

Scanned with CamScanner

ভয়ানক রাত

—*সুপ্রিয় কুমার দাস* (বি.এ, প্রথমবর্ষ, বাংলা অনার্স)

কয়েক বছর পর.....

আমি যখন মুম্বাই থেকে ফিরছিলাম, তখন আসার পথে আরশিনগর বলে একটা গ্রামে পৌঁছলাম। সেখানে আমার মাসতুতো দাদা ভুবন থাকত। অনেকদিন থেকে দেখা হয়নি, তাই ভাবলাম দুটো দিন থেকেই যাই। শীতের দিন রাত প্রায় ৯-১০টা হবে। রাস্তায় কোনো লোক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামে বিদ্যুৎ নেই বলে গ্রামটা অন্ধকার হয়ে আছে। দেখে যেন মনে হচ্ছে একটা মস্ত শ্মশান। মাঝে মাঝে শেয়াল, কুকুর আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে গা-টা যেন ঝিম-ঝিমিয়ে উঠছে। এরই মধ্যে একটা লোককে দেখতে পেলাম, সে সামনের দিকে হেঁটে চলেছে। পেছন ঘুরে আছে, গায়ে একটা মোটা ছেঁড়া চাদর। মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। আমি জোরে ডাকলাম, ' ও দাদা শুনছেন, এখানে ভুবনের বাড়িটা কোথায় বলতে পারবেন?' লোকটি থমকে দাঁড়াল এবং গম্ভীর স্বরে বলল, 'তুমি কোথা থেকে আসছ? চলে যাও।' আমার মনে হচ্ছে লোকটা পাগল। একথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার পায়ের দিকে চোখ পড়ল। আমি চমকে উঠলাম, মাথায় যেন একটা চক্কর দিয়ে উঠল। আশ্চর্য, লোকটির পা নেই, সে শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে খিলখিলিয়ে হাসতে লাগল, বিকট সেই হাসি। আমি সেখানে আর না দাঁড়িয়ে জোরে ছুটতে লাগলাম। অনেকদুর হাওয়ার পরে থামলাম এবং দেখলাম একটা বাড়ির দরজা খোলা, ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে গেলাম, দেখলাম বাড়িটিতে চারজন মানুষ আছে। সেখানে প্রবেশ করলাম, তারপর দেখলাম এটা ভুবন দারই বাড়ি। আমার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। ভুবন দা আমাকে চেয়ারে বসতে দিল। তার ছেলে তার মেয়ে দুরে বসে আছে। ভুবনদার বৌ ঐদিকটাই যেন কিছু করছে। আমি এক গ্লাস জল চাইলাম। বাড়িটায় আমার কেমন যেন অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে। কোথা থেকে যেন পচা, দুর্গন্ধ আসছে। হঠাৎ ভুবনদার বৌ জল আনল, জল খেতে যাব সেই সময় তার ঘোমটায়

Scanned with CamScanner

ঢাকা মুখটায় দেখলাম কয়েকটা কাটা দাগ, দেখে বিশ্রী লাগছে। আমি কী যেন একটা বলছিলাম হঠাৎ ছেলেদুটোর দিকে চোখ পড়ল, দেখলাম কী নিয়ে যেন একটা টানাটানি, ছেঁড়াছেড়ি করছে। তারপর কিছুক্ষন পর বুঝতে পারলাম ওটা একটা আধ খাওয়া মরা মানুষ। সেখানে আর থাকতে পারলাম না। ব্যাগ ফেলেই আবার ছুটতে লাগলাম। কতক্ষন থেকে যে দৌড়ে চলেছি তার ঠিক নেই, তারপর অনেকক্ষণ ছোটাছুটির পর দুরে কিছু আলো দেখতে পেলাম। একটু এগিয়ে বুঝতে পারলাম সেটা স্টেশনের আলো। সেই আলো দেখে আমি একটু ভরসা পেলাম। সেখানে গিয়ে একটা চায়ের দোকানে বসলাম, রাত তখন প্রায় বারোটা। সেই চায়ের দোকানদার আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কোথা থেকে আসছেন?' আমি বললাম, 'পাশের গ্রাম থেকে।' একথা শুনে লোকটা চমকে গিয়ে কাল, 'বলেন কী? সেখানে তো কেও যায়না। কারণ সেই গ্রামে বছর চারেক আগে একবার মহামারী হয়েছিল, সেই মহামারিতে সবাই মারা যায়, একটা কুকুর, পাখি পর্যন্ত বাঁচেনি। তখন থেকেই গ্রামটা শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। সেখানে কেউ গেলে নাকি ফিরে আসতে পারেনা।' তারপর লোকটি আমাকে বলল, 'আপনার কপাল ভালো তাই আপনি বেঁচে ফিরে এসেছেন।' একথা শুনে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলালাম। আবার একটু কষ্টও হল ভুবনদার পরিবারকে নিয়ে, যে তারা সবাই মারা গেছে একথা ভেবে। তারপর ছোটাছুটি করে ক্লান্তির জন্য কখন যে চোখে ঘুম এসেছে নিজেই জানিনে। হঠাৎ পাখির আওয়াজ, মানুষদের চিৎকারে ঘুম ভেঙে দেখলাম সকাল হয়েছে। এখনও চোখ বন্ধ করলে সেই ভয়ঙ্কর রাতের কথা সামনে ভেষে ওঠে।

Scanned with CamScanner

অতিথি

—সুস্মিতা সরকার
বি.এ, প্রথম বর্ষ (বাংলা অনার্স)

কিছু দিনের জন্য এসেছি এই পৃথিবীতে
প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধের স্বাদ নিতে।
স্নেহ -মায়া-মমতার বন্ধনে নিজেকে বাঁধতে
সুখে হাসতে, দুঃখে-কষ্টে কাঁদতে।
হঠাৎ হয়তো হারিয়ে যাবো ঐকোণে
আমার কথা হয়তো পড়বে না কারো মনে।
পৃথিবীর সুখ স্বাচ্ছন্দকে দিতে হবে ইতি।
হারিয়ে যাবে কোন্ অতলে এসব দিনের স্মৃতি।

Scanned with CamScanner

নজরুল স্মরণে

—মানজারুল ইসলাম
বি.এ, দ্বিতীয় বর্ষ (বাংলা অনার্স)

এক যে ছিল ছোট্ট ছেলে
নামটি দুখু মিঞা
জন্ম জেলা বর্ধমানে
গ্রামটি চুরুলিয়া।
দুখু মিঞার কাব্য গানে
ফুটলো 'ঝিঙেফুল'
বিদ্রোহী কবি তিনি
নামটি নজরুল।
হে বিদ্রোহী তোমায় জানাই
কোটি নমস্কার।
তুমি বহ্নিশিখা
সংগ্রামীর চির হাতিয়ার।
উৎপীড়িতের কবি তুমি হে
রক্ত লেখার কবি,
সাম্যবাদের কবি,
আমার প্রিয় কবি।

Scanned with CamScanner

দুটি রম্যরচনা

(১)
স্বপ্নশৈশব

—সাধন দাস, অধ্যাপক (বাংলা বিভাগ)

দুপুর গড়িয়ে হেমন্তের বিকেল এখন। দিগন্ত ছেয়ে গেছে হিম-কুয়াশায়। মাঝে মাঝে স্বপ্নে হাতছানি দিয়ে যায় শরতের শিউলি-সকাল। বড় হয়ে গেছি। অনেক বড়। বয়সে এবং অভিজ্ঞতায়। সংসারের কাঁটাঝোপে হাত-পা ছ'ড়ে গেছে অনেকবার। কতোবার বাতি নিভে গেছে, গর্জে এসেছে ঝড়ের রাত। কতোবার ছিঁড়ে গেছে জীবন বীণার তার। কিন্তু "কোথায় পালাবে? ধু ধু করে মরুভূমি/ক্ষয়ে ছাড়া মরে গেছে পদতলে।"

পালাবার কেবল একটা সুরঙ্গই আছে। যন্ত্রজীবনের যন্ত্রণা যখন বিধ্বস্ত করে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার যখন দূরতর দারুচিনি দ্বীপ হয়ে যায়, তখন এই হেমন্তের পড়ন্ত দুপুরে একটা মন-খারাপের হাওয়া আসে কোত্থেকে, 'জানলার পর্দাগুলো দুলিয়ে দিয়ে যায়, চোখে নামে তন্দ্রালসা ক্লান্তি আর সেই আনমনা জানলার পর্দা সরিয়ে, ধূমল ধূসর মাঠের রোদটুকু গায়ে মেখে, নদীর পাড় ধরে এঁকেবেঁকে অনেক অনেক পথ পাড়ি দিয়ে, চলে যাই আমার স্বপ্নশৈশবে।

ঘাসফড়িৎ-এর মতো নরম সবুজ সেই শৈশব—যেখানে ভোরের কুয়াশাভেজা মাঠে ডানা মেলে তিসির খেতে উড়ে বেড়ায় অন্য পৃথিবীর প্রজাপতিরা, যেখানে দুব্বোঘাসের ডগায় ডগায় ভোরের প্রথম আলো প'ড়ে মুক্তোদানা হয়ে যায় শিশিরকণারা, যেখানে পৌষের সন্ধায় পেছনের বাঁশবনে স্বর্গীয় জোনাকিরা অবিরাম সোহাগের আলপনা আঁকে, আর বাঁশবন পেরিয়েই যেখানে গা এলিয়ে শুয়ে থাকে উদাসীন মাঠ, অপুর মতো কল্পনার চোখে দেখতাম সেই মাঠের পারেই রামায়ন-মহাভারতের দেশ—যেখানে নাকি নরম মাটিতে পুঁতে যায় কর্ণের রথের চাকা!! প্রজাপতির মতো, ঘাসফড়িঙের মতো, জোনাকিদের মতো অবাধ উল্লাসে ভরা ছিল সেই শৈশব। পিঠে মস্ত বইয়ের ব্যাগ ছিল না, কম্পিউটার ইন্টারনেট ছিল না, মোবাইল ছিল না, ভিডিও

Scanned with CamScanner

গেম ছিল না, রোজ রাতে হোম টাস্ক ছিল না, ঘুমচোখে সাতসকালে খাঁচাবন্দী ভ্যানে গলায় জলের বোতল ঝুলিয়ে আন্টির সামনে হাজির হওয়া ছিল না..... শুধু ভোর হতে না হতেই কুসুম-রোদ গায়ে মেখে নিজেও মিঠে রোদ্দুর হয়ে যাওয়া, বাড়ন্ত বেলায় নদীর ঘাটে গিয়ে পালতোলা নৌকায় স্বপ্নের সওয়ারি হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া, বিকেলের অস্তরাগ চোখেমুখে মেখে নিয়ে, গা-ছমছম সন্ধ্যার অন্ধকারে, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে জোনাক-জ্বলা পথে বাড়ি ফেরা—এই ছিল আমাদের ডালিমফুলি রোজনামচা!

কতোদূরে ফেলে এসেছি সেইসব চাঁপারং দুপুর-সন্ধে! হাত বাড়িয়ে ছুঁতে চাইলেও নাগাল পাই না তার। আগের জন্মের ফ্যাকাশে স্মৃতির মতো মন-খারাপ-করা দুপুরের গায়ে একটুখানি ম্লান আলো হয়ে হয়তো সে জেগে থাকে কোথাও। কান্না পায়। অঝোরে কাঁদতে ইচ্ছে করে। ঋতুচক্রে ফিরে ফিরে আসে গ্রীষ্ম-বর্ষা-বসন্ত, কিন্তু জীবনচক্রে শৈশব কোনোদিন ফেরে না। সে শুধু স্বপ্ন হয়ে জেগে থাকে অলীক কোনো অনুভবের আকাশে!!

(২)
কন্যে বাঁচুক

মনে করুন, ঘুম ভেঙে দেখছেন— পৃথিবীতে কোনো মেয়ে নেই। গোটা বিশ্ব পুরুষময়! রাতারাতি কোন্ যাদুবলে উধাও হয়ে গেছে আপনার মা, বোন, আপনার স্ত্রী, কন্যা এবং প্রতিবেশিনীরাও। ছাদের রেলিঙে শাড়ি মেলতে যাওয়া পাশের বাড়ির যে-মেয়েটিকে আপনি প্রতিদিন আড়চোখে দেখে নেন, সেই মেয়েটিও হঠাৎ অদৃশ্য! যে-বৃদ্ধা মা আপনি বাড়ি ফিরলে আপনার পরিশ্রান্ত শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বলবে—'খোকা এলি, সারাদিন কিছু খাস নি বুঝি?' যে-কিশোরী কন্যাটি আপনার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে পরম মমতায় বলবে—'বাবা, তোমাকে এত বলি রোদে বেরিও না, তোমার প্রেসার হাই, কিছুতেই কথা শুনবে না!' যে-স্ত্রী একবাটি মুড়িবাদাম

Scanned with CamScanner

আর একগ্লাস ঠান্ডা জল মুখের সামনে রেখে বলবে—'সক্কালবেলা কিছু না খেয়েই বেরিয়ে গেলে!' কিম্বা যে-মেয়েটি মোবাইল অন করতেই দখিনা হাওয়ার মতো নীচু গলায় ফিসফিস করে বলবে—'আজও ভুলতে পারি না তোমাকে!'—তারা সবাই যদি কোনো এক দুঃস্বপ্নের ভোরে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায়, তাহলে পুরুষ কি একটা দিনও শান্তিতে কাঁটাতে পারবে? অন্ততঃ একটি ঘন্টা? চিরকালীন সৃষ্টির ধারা স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার কথা যদি বাদও দিই, তবু পুরুষের বলিষ্ঠ মন আর শক্ত বাহু কি পারবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য জীবন থেকে রসদ খুঁজে নিতে? যে-নারী সতত পুরুষের প্রেরণাদাত্রী, যে-প্রিয় নারীটির মুখে হাসি ফোটাতে দিগ্বিজয়ী রাজা যুদ্ধ জয় ক'বে স্বদেশে ফেরে, যে-নারীর জন্য প্রেমিক কবি বিশ্বসংসার তন্নতন্ন করে খুঁজে আনে ১০৮ টা নীলপদ্ম আর দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বাঁধে লাল কাপড়, সেই পুরুষ-কবি নারীহীন পৃথিবীতে কী নিয়ে বাঁচবে তখন? অথচ কন্যে, এই পুরুষের পৃথিবীতে প্রতিদিন তোমার কতো না দুর্গতি! যেন কৃপাপ্রার্থী তুমি!! ভ্রূনেই তোমার মূল উপড়ে ফেলছে কতো পুত্রপিয়াসী দম্পতি। এক সংসারে বড় হয়েও ভাইয়ের পাতের বড় মাছের মুড়োটার দিকে জুলজুল চোখে তোমাকে আজও তাকিয়ে থাকতে হয়! তোমার জন্য পরিবারে-সমাজে কতো শাসন-বারণ-চোখরাঙানি! তারপরেও পথ হারিয়ে কোনোদিন যদি পড়ে যাও বাঘ সিংহ হায়েনার হিংস্র থাবায়, তাহলে হাতবদল হতে হতে কোথায় যে অন্ধকারে তলিয়ে যাও তুমি, আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজ তার খোঁজও রাখে না। 'অথচ তোমাদের মধ্যেই তো লুকিয়ে থাকে খনা, গার্গী, মৈত্রেয়ীরা!! তাই বলি, কন্যে তুমি জাগো! কঙ্কা, বনলতা, মালতীর মতো আবার তোমার প্রয়োজন দশপ্রহরণ ধারিণী দেবী দুর্গার মতো.....

Scanned with CamScanner

অসম্পূর্ণ

—মনীষা দাস (বি.এ, প্রথমবর্ষ, বাংলা অনার্স)

যে কোনো পিতা মাতা তাদের শিশুকে বহু যত্নে বড় করে তোলেন। তারপর তারা শিক্ষা লাভের যোগ্য হয়। পরবর্তীকালে স্কুলে যায়, তারপুর কলেজে। আমিও একদিন ছুটির পরে কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিলাম বান্ধবীদের সাথে কথা বলতে বলতে। কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হয়েছিল তাই মনোরম পরিবেশটা দুপুরবেলা প্রায় নিস্তব্ধ ছিল। রাস্তায় তেমন ভিড়ও ছিল না। গাড়ির বিকট শব্দও ছিল না। বান্ধবীদের সাথে কথা বলা, হাসি মজা হয়তো চলতেই থাকত যদি না চোখে পরত এক দৃশ্য। দেখার পর কিছুক্ষণের জন্যেও চুপ করে থাকলাম। দেখলাম রাস্তার পাশে এক বৃদ্ধ মহিলাকে কিছু ছোট ছোট ছেলে ঢিল, পাথর ছুঁড়ছে, কেউ কেউ তাকে জলও ছেটাচ্ছে। কিন্তু সেই মহিলা তেমনভাবে কোনো প্রতিবাদ করতে পারছিলেন না কারণ তিনি স্বাভাবিক ছিলেন না, এককথায় বলতে গেলে তিনি ছিলেন abnormal । জল ছেটানোর ফলে তিনি ভিজে যান, কিছু পাথর তার গায়ে এসে লাগে তিনি ব্যাথা পান। নবম শ্রেণীতে পড়েছিলাম লেখক Ruskin Bond-এর 'Most Beautiful' গল্পে abnormal মানুষের কথা। এই মহিলা শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই স্বাভাবিক ছিলেন না। আমি পথের দৃশ্যের নীরব দর্শক হয়ে রইলাম। পারলাম না লেখক Ruskin Bond -এর মতো সেই মাতৃসমাকে দুষ্টু বাচ্চা ছেলেদের হাত থেকে রক্ষা করতে, পারলাম না তাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে।

ভারতীয় দর্শন তত্ত্ব বলে, প্রত্যেকটা মানুষকেই তার কর্মের ফল জন্মজন্মান্তরেও ভোগ করতে হয়। বর্তমানে পরিবেশ এতটাই পাপে পূর্ণ হচ্ছে, দূষিত-কলুষিত হচ্ছে, মানুষ খারাপ কাজে নিযুক্ত হচ্ছে তারই পরিণাম মানুষকে হয়তো এই বিকলাঙ্গ, অস্বাভাবিকতার মাধ্যমে ভোগ করতে হচ্ছে।

তারপর আমি বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু জানলাম না সেই মহিলা কোথায় আছেন, কীভাবে আছেন, যিনি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত রৌদ্রে পুড়ে ।বৃষ্টিতে ভিজে

Scanned with CamScanner

রাস্তার উপর শবদেহের মতো পড়ে থাকেন। যার না থাকে ভালো একটা বস্ত্র, না থাকে একটা ভালো আশ্রয়, না তারা দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়। আমরা তো তাদের দিকে একবারের জন্যও চোখ তুলে দেখি না কিংবা দেখতে চাই না। আমরা তাদের সহায়ক হয়ে উঠতে পারি না, শুধু পারি তাদের আঘাত করে সামান্য আনন্দ উপভোগ করতে। তারা তো আমাদের এতটাও ক্ষতি করে না। আমাদের উচিত নয় তাদের বিরক্ত করা কিংবা আঘাত করা। আমরা বুঝি না যে তারাও মানুষ, তাদের মধ্যেও বেঁচে থাকার ইচ্ছে আছে, আশা আছে, ভালোবাসা আছে। শুধু আমাদের সঙ্গে পার্থক্য এটুকুই যে তারা আমাদের মতো তা প্রকাশ করতে পারে না।

নানান শিক্ষা অর্জনের পরেও, সুশিক্ষিত হওয়ার পরেও কোথাও যেন আমাদের একটা শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়.....

মানুষের মতো মানুষ হওয়ার শিক্ষা।

Scanned with CamScanner

ভালোবাসা

—ওমার ফারুক আনসারী
বি.এ, প্রথম বর্ষ , দর্শন (অনার্স)

পৃথিবীর সকল মানুষের হৃদয়ে রয়ে গেছে ভালোবাসা,
তবু আমরা ভালোবাসাকে করিনা সম্মান।
বর্তমান সমাজ ভালোবাসাকে করেছে পুতুল খেলনা,
তাই ভালোবাসার প্রতি মানুষের বিশ্বাস জন্মায় না।

তবু ভালোবাসার জন্য পৃথিবী আজও আকুল
মানুষ আবার ভালোবাসার জন্য চঞ্চল
ভালোবাসা দিলে কভু হয় না কো শেষ,
তবু ভালোবাসার অভাবে হাহাকার করে দেশ।

ভালোবাসার অর্থ কত জন জানে?
তবুও ভালোবাসা থাকে আমাদের মনে।
যেমন কয়লা ধুলে ময়লা যায় না,
অন্তর দিয়ে ভালোবাসলে ভোলা যায় না।

ভালোবাসা দিলে কোনো দিনও হয় নাকো ক্ষয়,
ভালোবাসা ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা বড় দায়।
ভালোবেসে ভালোবাসা কত জনে পায়,
তবুও তো ভালোবাসা সব লোকে চায়।

Scanned with CamScanner

অবহেলিত মা

—সারমিন সুলতানা (বি.এ, তৃতীয়বর্ষ, বাংলা সান্মানিক)

একদিন হঠাৎ কার্ত্তিক মাসের সকালে অপু ঘুম থেকে উঠে হাসতে শুরু করে, মা এসে কারণ জিজ্ঞাসা করলে অপু বলে—

'মা জানো ভালো স্বপ্ন দেখলাম'

মা বলে কী স্বপ্ন রে? অপু বলে সে এখন তুমি বুঝবেনা, বলে অপু বিছানা থেকে উঠে হাসতে হাসতে বাইরে মুখ ধোয়ার জন্য চলে গেল। মা আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে হেসে জল খাবার করব বলে রান্না ঘরে চলে গেল।

অপু স্নান সেরে জল খাবারের জন্য এলো খাবার টেবিলে। মা খাবার নিয়ে এলো। অপু খেতে খেতে মা কে বলল মা আজ কলেজ থেকে ফিরতে দেরি হবে। মা হেসে বলল কারণটা কী সেই সকাল বেলার স্বপ্নটা ? অপুও হেসে উত্তর দিল, "সেটাই ভেবে নাও।" মা বলল, "তা সে কে আমাকে বল আমি তাকে আমার ঘরের লক্ষী করে নিয়ে আসব।" অপু বলে, "মা তুমি তো আমার সব, আগে তোমার স্বপ্ন পূরণ করি, তারপর তোমার ঘরের লক্ষী নিয়ে আসব, ছোটবেলায় তো বাবাকে হারিয়েছি, এখন যা কিছু আমার সবই তুমি মা। মা জানো আমার সামনে মাসে ইন্টারভিউ, সেখানে পাশ করে গেলেই আমি স্কুল মাষ্টার হয়ে যাবো। তারপর আমাদের ছোট সংসারে আর কোন কিছু অসুবিধা হবেনা। তুমি, আমি শান্তিতে থাকব। তারপর মা বলে উঠল, "আর আমার ঘরের লক্ষীটি?" একথা বলে মা ও অপু দুজনেই হাসতে লাগল।

প্রায় চারমাস পরে অপুর চাকুরী হয়ে গেল। মা ও অপু খুব খুশী। অপুর চাকরীর ঠিক কিছুদিন পরে মা অপুকে বলে, "হ্যারে অপু, আমার লক্ষীটিকে কবে নিয়ে আসবি? অপু বলে, "খুব শীঘ্রই মা।" তার ঠিক দু-মাস পরে অপু বিয়ে করে, অপুর বউ গীতা। গীতা নামটির মত যদি গীতার আচরণটিও পবিত্র হত তাহলে হয়তো মায়ের সুখের স্বপ্ন, সুখের সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে যেতনা।

Scanned with CamScanner

বিয়ের পরদিন থেকেই মা এর ঘরের লক্ষী মা-এর জীবনে নিয়ে এল ঘন অন্ধকার। মা-এর লক্ষী গীতা মা-এর সাথে কখনো ভালোভাবে মিশতনা। গীতা সংসারের কোন কাজই করতনা। সব কাজ মা-ই করত। তবুও মা গীতাকে মেয়ের মতই ভালোবাসত। গীতার এই সংসারে মন বসেনা। গীতা অপুকে নিয়ে আলাদা বাড়িতে আলাদা থাকতে চায়। সে চায়না মা-এর সাথে থাকতে। এই কারণে গীতা, অপুকে ধীরে ধীরে মা-এর সমন্ধে কু-কথা বলতে শুরু করে। অপুকে বলে তার মা নাকি সারাদিন তার সাথে দ্বন্দ্ব করে। কথায় কথায় নাকি গীতাকে তার বাবার বাড়ি চলে যেতে বলে। কিন্তু মা কী সত্যই একথা গুলো বলেছিল, তা জানার অপু কোনদিন চেষ্টা করেনি। অপু গীতাকে কখনও প্রতিবাদ করে বলেনি যে মা এসব কথা কখনই বলবেনা, বা কখনও গীতাকেও জোর করে বলেনি যে মা এর সম্বন্ধে এসব কথা বলবেনা। অপু চুপচাপ বোকার মত গীতার কথা শুনত।

গীতা প্রথম থেকেই মা-এর সাথে থেকে সংসার করতে চায়নি। সে অপুকে নিয়ে আলাদা থাকবে এটা তার চিরকালের আশা। কিন্তু অপু মা কে ছাড়তে চায়নি। গীতাকে অপু বুঝিয়ে বুঝিয়ে মায়ের সাথে থাকতে বলে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই অপুও মা-এর সাথে গীতার মত ব্যবহার করতে লাগল। অপুও মা-কে কু-কথা বলে। সংসারে অশান্তি শুরু হল। অপু মায়ের আর খোঁজ নেয়না, মা-কে সরাসরি বলতেও পারেনা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু হঠাৎ একদিন মা বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। সেদিন মায়ের সব থেকে বড় দুঃখ, গীতা বা অপু কেউ জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করলনা মা কোথায় যাচ্ছে। বরং ওদের আনন্দই হচ্ছিল, মা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায়।

ছয় বছর কেটে গেল মায়ের বাড়ি ছেড়ে যাওয়া। কিন্তু এই ছয় বছরে অপু মায়ের একদিনও খোঁজ নেয়নি। নেবেই বা কেন, তারা তো ভালোই দিন কাটাচ্ছে। গীতাও মা হয়েছে, অপু বাবা। তাদের দুজনের পুত্র গিরিশ। তাদের একটা পুত্র নিয়ে সুখের সংসার। হঠাৎ একদিন গিরিশ এর শরীর খারাপ। ডাক্তার দেখানো হল, ডাক্তারে বললেন নিমোনিয়া হয়েছে। এই ভেবে অপুর খুব চিন্তা তার ছেলেকে নিয়ে। দিন

Scanned with CamScanner

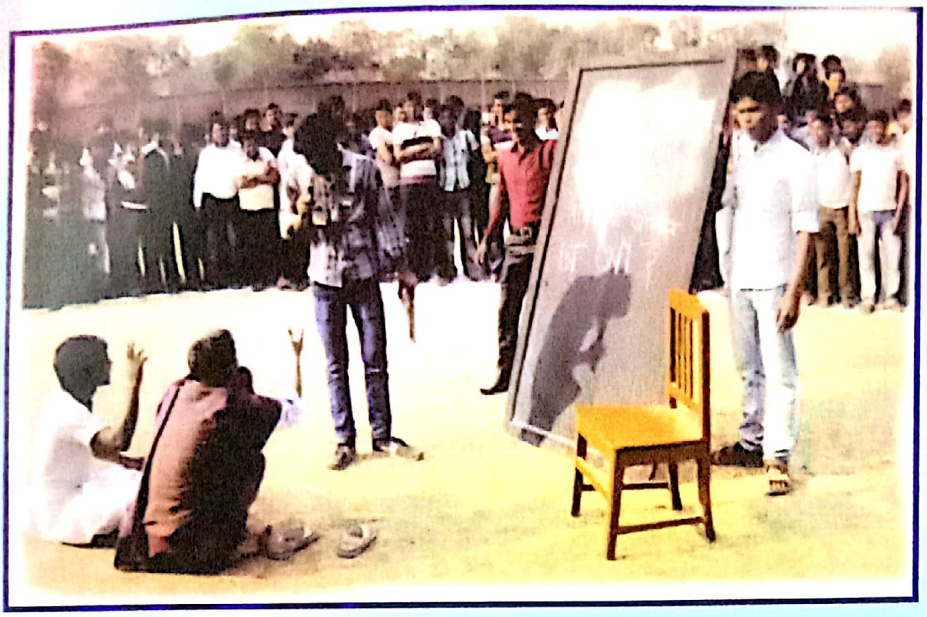

যেমন খুশি সাজো-তে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের একটি দল

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের নাটক

একটি শ্বাস ত্রস্ত ম্যাচে এস্ত গোলকিপার

Scanned with CamScanner

শিক্ষামূলক
ভ্রমণে
হাজারদুয়ারী

বার্ষিক
ক্রীড়ানুষ্ঠানে
মিউজিক্যাল চেয়ার

কলেজ মাঠে
ফুটবল ম্যাচ
শুরুর পূর্বমুহূর্ত

Scanned with CamScanner

খেলা শুরুর
আগে
খেলোয়াড়দের
সঙ্গে করমর্দন

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

কলেজ সাংস্কৃতিক
অনুষ্ঠানে এক শিশুশিল্পী

Scanned with CamScanner

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য

কলেজ মাঠে বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে দৌড় প্রতিযোগিতা

এন.এস.এস প্রোগ্রামের অন্তর্ভূক্ত একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ

Scanned with CamScanner

দিন গিরিশের শরীর আরও খারাপ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত গিরিশ মারা যায়। ছেলের মৃত্যুর শোকে অপু গীতা দুজনেই ভেঙে পড়ে। তাদের কাছে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল। গীতা তো ছেলের শোকে মাঝে মাঝে অচেতন হয়ে পড়ে। এবং বলে তার জীবন অন্ধকার তার ছেলে ছাড়া। গিরিশের মৃত্যুর পর অপুর মা-এর কথা খুব মনে পড়ল এবং মা-এর কথা ভেবে মনে মনে সে দুঃখ পেল। গীতাও মা-এর কথা মনে করল এবং সে ভাবতে লাগল সে অপুকে মা -এর কাছ থেকে আলাদা করেছে বলে ভগবানও তার পুত্রকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিল। গিরিশের মৃত্যুর পর তারা বুঝল মা ও ছেলের ভালোবাসা। গীতাও তো অপুকে কেড়ে নিয়েছে মায়ের কাছ থেকে, এসব বুঝতে পেরে দু-জনেই মা কে ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য মায়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

প্রায় তিন মাস পর জানা গেল মা এক বৃদ্ধাশ্রমে থাকছে। তারা দুজনেই সেখানে যায়। বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে জানা গেল মা-এর শরীর খুব খারাপ, শেষ নিঃশ্বাস চলছে। বৃদ্ধাশ্রমের একটি মহিলা অপু ও গীতাকে মায়ের ঘরে নিয়ে গেল। অপু দেখল, মা সেখানে একটি খাটে শুয়ে পথের দিকে চেয়ে আছে, অপু মা এর খাটের পাশে গিয়ে বসল, মা জল ভরা আবছা আবছা চোখে অপুর দিকে তাকাল এবং অপুকে বলল—

"তোর এতক্ষণে ঘুম ভাঙল রে, অপু"

অপু মা, মা, মা করে ডাকতে লাগল। কিন্তু মা-এর আর কোনো সাড়া এলোনা।

Scanned with CamScanner

সুখ

—আব্দুল হামিদ খাঁন
বি.এ, তৃতীয় বর্ষ , (দর্শন অনার্স)

ছোট্ট একটা রত্ন আছে
জানে সর্বজনে,
জীবনে একে জয় করিবার
প্রয়াস থাকে মনে।

গরীব থেকে ধনী সবাই—
ছুটছে এরই পিছে,
কিন্তু এটা বড়ই চতুর
ধরা দেয় না মিছে।

"সোনার হরিণ" বললে এসে
ভূল হবে না মোটে,
আধেক জীবন গেছে চলে
এরই পিছে ছুটে।

সকলেরই কাম্য এটা
খুবই এর দাম,
অবশেষে বলছি শোন
"সুখ" এরই নাম।

Scanned with CamScanner

কন্যা সন্তান ঃ আশীর্বাদ না অভিশাপ

—ফিটু সেখ (বি.এ, দ্বিতীয় বর্ষ, শিক্ষাবিজ্ঞান অনার্স)

আধুনিক যুগে দেখা যায় যে কন্যা সন্তান মানেই বড় ঝামেলা। আমরা কোন ক্রমে কন্যা সন্তানকে এড়িয়ে গেলেই মনে হয় ভালো হয়। ফলে আমরা কী করি ? কোন মহিলা গর্ভবতী হলেই প্রথমে আমরা আশা করি যে তার পুত্রসন্তান হবে। কিন্তু বর্তমান আধুনিক যুগ হল প্রযুক্তি বিদ্যার যুগ। ফলে সে মহিলার গর্ভে কী সন্তান আছে তা খুব সহজেই আজকাল জানা যায়, যদিও তা আইনবিরুদ্ধ। যদি দেখি যে সেই মহিলার গর্ভে পুত্র সন্তান রয়েছে, তবে দেখা যায় যে তারা কত খুশি। তারা সেই গর্ভবতী মহিলাটির প্রতি কত যত্নবান হয়, তারা তাকে কত ভালোবাসে। কিন্তু যখনই কন্যা সন্তানের কথা আসে তখন কেন জানিনা তাদের পরিবার মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা যেন সেই গর্ভবতী মহিলাটিকে অপরাধী মনে করে। সে যেন একটা বিরাট ভুল করে ফেলেছে কন্যা সন্তান গর্ভে ধারণ করে। তাই দিনের পর দিন এই ভুলের মাশুল দিতে হয় তাকে। পরিবারের সদস্যরা তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করে, তাকে ঠিক মতো খেতে দেয় না, বাড়ির সমস্ত কাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নেয়। কিন্তু তাতেও কী রক্ষা । যে কন্যা সন্তানটির জন্য গর্ভবতী মা এত কষ্ট সহ্য করছে, সে কী রক্ষা পাবে তাদের হাত থেকে? না প্রথমেই তারা সেই কন্যা সন্তানটিকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করবে, যদি তাতেও কাজ না হয় আর কোন ক্রমে কন্যা সন্তানটির জন্ম হয়, তবে তাকে গলাটিপে হত্যা করার চেষ্টা করবে, যদি তাতেও কাজ না হয়, তবে সেই কন্যা সন্তানটিকে বাড়িতে বরণ করে না নিয়ে তাকে ডাস্টবিনে ফেলে দেবে। সেই সন্তানটির স্থান হবে রাস্তার ডাস্টবিন, এতিমখানায়। এটাই কি তার প্রাপ্য ছিল? আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা তাকে কেন অভিশাপ বলে মনে করছে? কেননা, তারা মনে করে যে কন্যা সন্তান মানেই একটা বাড়তি ঝামেলা। তাদের পেছনে শুধু খরচ আর খরচ। তাদের কাছ থেকে কোন কিছু পাওয়ার আশা করা যায় যা। বরং তাদের জন্য বাবা-মাকে নিঃস্ব হতে হয়। আর এই কন্যা সন্তানকে অভিশাপ ভাবার

Scanned with CamScanner

পেছনে একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে, এযুগের একটি অভিশপ্ত প্রথা "পণ প্রথা"। যার জন্য এই কন্যা সন্তানের পরিবারকে পথের ভিখারিতে পরিণত হতে হয়। এতেও কী রক্ষা ? সেই মেয়ের সুখের জন্য তার পরিবারের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার আসবাব পত্র, টিভি, ফ্রিজ, এসি ইত্যাদি কত কিছু আবদার করা হয়। যদি দিতে পারে তবে খুব ভালো, আর যদি না দিতে পারে তবে সেই নারীর ওপর অবিরত অত্যাচার। ফলে এই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা এই কন্যা সন্তান কে অভিশাপ বলে মনে করে।

কিন্তু তারা সত্যি কী অভিশাপ? না, তারা অভিশাপ নয়। তারাও এই যুগে আর্শীবাদ স্বরূপ। তারাও যুগের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। আমরা যদি কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যাই, তবে দেখতে পাবো কতো নারী যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে, যখন ইংরেজ শাসনে দেশবাসী ক্ষিপ্ত, তখন তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে এই নারীজাতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। তারাও দলে দলে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন বিদূষী নারী হল—ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাঈ, মাতাঙ্গিনী হাজরা প্রমুখ। এছাড়া লক্ষ লক্ষ নারী এই সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এদের কথাও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে আছে। নারীদের এত বীরত্ব থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন তাদেরকে অভিশাপ বলে থাকি? কেন মেনে নিতে পারছি না যে তারা অভিশাপ না। কেন ভুলে যাচ্ছি আমরা একজন নারীর হাত ধরেই এই পৃথিবীতে এসেছি। যদি আমরা তাদের অভিশাপ ভেবে এই ভাবে হত্যা করি, তবে একদিন এই নারীর অভাবে পৃথিবীতে মারামারি, হানাহানি শুরু হবে। এই পৃথিবী ধ্বংসের কোলে ঢলে পড়বে। পুরুষরা তখনই নিজেকে ধন্য মনে করে যখন একজন শিক্ষিত বুদ্ধিমতী নারী তার জীবনসঙ্গী হয়। পুরুষরা নারী ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। সমস্ত শিশু জন্মের পর একজন নারীর কাছে (মা) লালন পালন হয়ে মানুষ হয়। নারী ছাড়া এই সমাজ ব্যবস্থা একে বারে পঙ্গু। তবে কেন আমরা এই নারী জাতীকে (কন্যা সন্তান) অভিশাপ বলে মনে করি। তখন কি আমাদের মনুষ্যত্ব বোধ টুকুও হারিয়ে যায়? আমরা যখন সুখে-দুঃখে সব কিছুতেই নারীকে পাশে রাখি; তবে নিজের বেলায়, কন্যা সন্তানের

Scanned with CamScanner

জন্ম হলে এমন ভাবি কেন? কেন পারি না তাদেরকে ভালোবেসে বুকে আগলে রাখতে?

তাই আমার সকল ব্যক্তিবর্গের কাছে অনুরোধ যে তারা যেন তাদের কন্যা সন্তানকে অভিশপ্ত না ভেবে তাদেরকে আর্শিবাদ স্বরূপ বুকে টেনে নিয়ে মানুষের মত মানুষ তৈরী করে। বর্তমান যুগে প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে এই মহিলারাই মহাকাশে তাদের পদচিহ্ন রেখে দিয়েছেন। এছাড়াও এভারেস্টের চূড়ায় আরোহন করেছেন। এমন কী বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। এটা কী বিস্ময়কর বিষয় নয়? ফলে তাদেরকে অবহেলা না করে, একই সুতোর বাঁধনে বেঁধে একই ছাদের তলায় বিভিন্ন কাজে এক সাথে অংশ গ্রহণ করা উচিত। তারাও এই দেশকে, এই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম। তবে আপনারাই বলুন, আধুনিক সমাজে কন্যা সন্তান কী অভিশাপ ??

Scanned with CamScanner

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মিড-ডে মিল

—সামিম হাসান (বি.এস.সি, ৩য় বর্ষ)

"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা,
সব শিশুরই অন্তরে"

ভূমিকা :

প্রতিটি শিশুই একটি ভবিষ্যতের মানব। শিশুদের বুকের মাঝে ঘুমিয়ে থাকে ভবিষ্যত মানবের সব শক্তি ও সম্ভাবনা, অনুকূল পরিবেশে যথাযথ শিক্ষা ও পরিচর্যা পেলে বীজের আকারে ঘুমিয়ে থাকা শক্তি সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়ে পত্র পল্লবে শাখা প্রশাখায় নিজেকে মেলে ধরে পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

মিড-ডে-মিল বা মধ্যহ্নভোজন এর ভাবনা বর্তমান ভারতে নতুন নয় । ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে মাদ্রাজ পৌরসংস্থা দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মধ্যহ্নভোজন প্রথম চালু করেন ১৯২৫ সালে, মাদ্রাজের মতো অন্যান্য রাজ্যেও এই মধ্যহ্ন ভোজন প্রকল্প ছড়িয়ে পড়ে পড়ে, যেমন উত্তর প্রদেশে ১৯৫৩ সালে। তামিলনাড়ু রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম প্রাইমারী স্কুলে মিড-ডে-মিলের ব্যবস্থা করে, এরপর কিছু সময়ে মধ্যে প্রতিটি রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে, ভারত সরকারের অনুমোদনে ১৯৯৫ সালে প্রাথমিক ধাপ সম্পন্ন হয়। এরপর ২০০২ সালে সুপ্রিমকোর্টের অনুমোদনে রান্নার কাজ শুরু হয় সমস্ত সরকারী ও আধাসরকারী স্কুলে।

মিড-ডে-মিল চালুতে সরকারের লক্ষ্য : মিড-ডে-মিল স্কিম চালুতে সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল ৫-১৪ বছরের সমস্ত শিশুকে স্কুলমুখী করা, এবং যাতে করে রাজ্য তথা দেশের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পায়, তাই সরকারের ধারণা এলো, প্রতিটি প্রাথমিক উচ্চ প্রাথমিক, S.S.K ও M.S.K স্কুলে এই স্কিম চালু করা যাতে করে দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর ছেলেমেয়েরা যারা একমাত্র আর্থিক অনটনের জ্বালায় ঠিকমতো

Scanned with CamScanner

খেতে পায় না, সে সমস্ত শিশুরা খাওয়ার লোভেও স্কুলে আসবে, আর এলেই সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পাবে।

মিড-ডে-মিল স্কিম চালু হওয়ায় বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, প্রয়োজনীয় সামগ্রী (চাল-ডাল-সব্জি) যার কাছ থেকে ক্রয় করা হচ্ছে সে লাভবান হচ্ছে।

পঞ্চায়েত স্তরে বা ব্লক স্তরে এই স্কিম দেখাশোনার জন্য পরিদর্শক (Inspector) নিয়োগ হচ্ছে যার ফলে শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা কর্মসংস্থান পাচ্ছে এমনকি রান্নার কাজেও কয়েকজন রাঁধুনীর প্রয়োজন হচ্ছে ফলে কিছু শিক্ষিত মহিলা স্বর্ণিভর হচ্ছে। ফলে কিছু সংখ্যক মানুষ এই স্কিমের সাথে নির্ভরশীল হয়েছে। আমাদের অলক্ষে কর্মসংস্থানও কী সরকারের লক্ষ্য নয়?

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় মিড-ডে-মিলের প্রাসঙ্গিকতা : বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এই স্কিম চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এই স্কিমের অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ এখনও রাজ্য তথা দেশে বিভিন্ন প্রান্তে, অনেক পরিবার দরিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে, ঠিকমতো খাবার খেতে পায় না। এমতো অবস্থায় কীভাবে তারা তাদের সন্তানদের স্কুলমুখী করবে, ফলে তারা শিশু-শ্রমিক হচ্ছে, শিক্ষার আলো পাচ্ছে না। তাই ভারত সরকার প্রতিটি সরকারী ও আধা সরকারী স্কুলে এই স্কিম চালু করেছে। অনেক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী স্কুলমুখী হয়েছে মধ্যহ্নভোজনের খাবারের আশায় ।কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার আঙিনায় ঢুকে শিক্ষাকে ভালোবেসে ফেলেছে। শিখেছে শিষ্টাচার নিয়মানুবর্তিতা , একদিন তারাই হবে দেশের ভবিষ্যত।

সমস্যা : বর্তমানে মধ্যহ্নভোজন স্কুলের পড়াশোনাকে বিঘ্নিত করছে, স্কুলের শিক্ষক মহাশয়ের নজর নেই কীভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে হবে, তিনি শুধু মগ্ন মধ্যাহ্ন ভোজনের খাবারের হিসেবে। কীভাবে কমখরচে এই কাজটি করা যায় তার জন্য সস্তা চাল-ডাল-শাকসব্জি কেনার হিসেবের ফলে তার ক্লাসে কোন ধ্যান নেই।

Scanned with CamScanner

(ii) ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সামনে রান্না দেখতে ব্যস্ত, পাঁখির চোখ করে, যে কখন রান্না হবে আর আমরা খেয়ে থালা বাজাতে বাজাতে বাড়ি যাবো। পড়াশোনায় তাদের কোন লক্ষ্য নেই, তাদের মূল লক্ষ্য খিচুড়ি খাওয়া, পড়াশুনা নয়।
বাংলায় নচিকেতার একটি গান আছে—

"দুপুর বেলা খাওয়ার পরে
ঘুমোতে ইচ্ছে করে"।

মধ্যহ্নভোজনের পর বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রী ঘুমকাতর হয়ে পড়ে, ফলে পড়াশুনায় মন বসেনা, তখন শিক্ষক মশায় স্কুল ছুটি দিতে বাধ্য হয়।
(iii) এই স্কিমের প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রী অনেকদিন ধরে গুদামে থেকে যাওয়ায় খারাপ হয়ে যায়, এবং সেসমস্ত খাবার খেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললেই নজরে আসে অমুক স্কুলে মিড-ডে-মিলের খাবার খেয়ে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী অসুস্থ।
(iv) বেশীরভাগ স্কুলে খাবার খাওয়ার পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় ছেলেমেয়েদের ক্লাসরুমের মধ্যেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেতে হয়, এর ফলে কোলাহলের সৃষ্টি হয় ক্লাসরুম নোংরা হয়।

সমাধান :- বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এই স্কিমের যে সমস্যা তা সমাধান করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। দুপুরবেলা খাবার পর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আলস্যভাব দেখা দিচ্ছে, ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ায় মন বসে না। তাই আমার মতে এই খাবার দুপুরবেলা না দিয়ে ক্লাস শুরুর পূর্বে দেওয়া হোক। যদিও সরকারী কঠোর পদক্ষেপ ছাড়া করা সম্ভব নয়। অনেক পরিবারের ছেলেমেয়েরা না খেয়ে স্কুলে আসে ফলে পড়ায় মন বসে না। ক্লাস শুরুর পূর্বে খাবার খেলে শরীর ও মন দুই সুস্থ থাকবে, পড়াশোনাও ভালো হবে। আমরা জানি বর্তমানে হোস্টেলে বা মেসে সুন্দর পরিকাঠামোতে ভালো পড়াশোনা হয়। সেক্ষেত্রে খাবার খাওয়া / পড়া / খেলাধুলা রুটিনমাফিক চলতে থাকে। তেমনই এই স্কিম ক্লাসের পূর্বে হলে খুব সুবিধে হয়।

Scanned with CamScanner

সীমাবদ্ধতা : এই স্কিমের সীমাবদ্ধতা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই। সমাজের অনেক মধ্যবিত্ত স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা আত্মসম্মান বজায় রাখতে মিড ডে মিল এড়িয়ে চলতে চায়, হাতে থালা নিয়ে স্কুলে যেতে লজ্জা বোধ করে। ফলে এই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা উভয় সঙ্কটে পড়ে।

বর্তমান সমাজে উচ্চ-নিম্ন মধ্যবিত্তের বাস। মিড-ডে-মিলের ধারণাটি নিম্নবিত্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উচ্চবিত্ত ও স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক বিষয়টি আত্মসম্মানবোধে মেনে নিতে পারেন না। অর্থাৎ মিড-ডে-মিল সমাজের সব শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

উপসংহার : মিড-ডে-মিল স্কিম বাস্তবায়িত হলে এরাজ্যে দারিদ্রের কারণে স্কুলে না আসা এবং নিরক্ষতার অভিশাপ দূর হবে। আশার কথা এই যে সাম্প্রতিক প্রস্তাবিত বাজেটে মিড-ডে-মিলের খাতে বরাদ্দ কৃত অর্থের পরিমাণ বাড়িয়েছে।

প্রতিটি নাগরিক শিক্ষিত হলে শুধু গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্তই পূর্ণ হবে না, গণতন্ত্রও হবে সার্থক। শিক্ষার জ্যোতির্ময় আলোয় অশিক্ষা ও অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হলে সমাজ সংস্কার ও দেশের উন্নয়ন হবে তরান্বিত, আর এর জন্য প্রয়োজন মিড-ডে-মিলের সঠিক বাস্তবায়ন।

Scanned with CamScanner

যদি আসি

—মোঃ মোফাক হোসেন
(প্রাক্তন ছাত্র)

নতুন কোন প্রজন্মে
কুশায়ার সিঁড়ি বেয়ে,
আমি আসি ফিরে আসি
তোমার ছায়ায়—
পারবে আপন করে,
হৃদয়ের গভীরে লুকাতে?

কত শতাব্দী পরে
আবার এসেছি পেতে ফিরে
পাব কি সেই নীলাকাশের
মধ্য গগনে?
যে ভাবে পেতাম মনের গহনে!

তুমি কি পারবে আনতে
শিশির সিক্ত আলোর প্রভাত?
পড়ন্ত বেলায় নেই আজ
পাখির আনাগোনা—
শুধু বাদলের ধারা
ঝরে যায় অবিরাম।

Scanned with CamScanner

তুমি

—ওয়াসিম আকরাম
বি.এ দ্বিতীয়বর্ষ (বাংলা অনার্স)

নির্জন ঘন এক অন্ধকার,
চেয়ে দেখি
কেউ নেই
শুধু তুমি

প্রভাতের ঘন কুয়াশার আড়লে,
কেউ নেই,
শিশির হয়ে
শুধু তুমি।

ঘন কালো মেঘের আড়ালে,
কেউ নেই,
বৃষ্টি হয়ে
শুধু তুমি।

দুরের মরুভূমির প্রান্তরে,
কেউ নেই,
বালি হয়ে
শুধু তুমি।

Scanned with CamScanner

রাতের পূর্ণিমার আকাশে,
কেউ নেই,
জ্যোৎস্না হয়ে
শুধু তুমি।

মনের তৈরী কঠিন হৃদয়ে,
কেউ নেই,
ভালোবাসা হয়ে
শুধু তুমি।

Scanned with CamScanner

অরঙ্গাবাদ : নেতাজী স্ট্যাচুর ইতিকথা

আজিজুল হক—(প্রাক্তন ছাত্র)

"স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নারী, ধনী ও দরিদ্র সকলের জন্য স্বাধীনতা। ইহা শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় বন্ধন মুক্তি নহে। ইহা অর্থের সমান বিভাগ, জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির বর্জনকেও সূচিত করে।"—সুভাষচন্দ্র বসু

সমাজ প্রেমিক, দেশপ্রেমিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজীকে বিশেষ বিশেষণে চিহ্নিত করা খুবই জটিল বিষয়। তাঁকে সমগ্রদেশের মানুষ চিনেন ও জানেন। তাঁর নামে দেশের বিভিন্ন জায়গায় স্ট্যাচু রয়েছে—সেটা অনেকেরই অজানা নয়। অনুরূপ একটি স্ট্যাচু নিমার্ণ করা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ঊনচল্লিশ বছর আগে অরঙ্গাবাদ শহরে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিমূর্তিটি 'নেতাজী স্মারক কমিটি অরঙ্গাবাদ' কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল। সালটা ২৩শে জানুয়ারি ১৯৭৭। স্ট্যাচুকে কেন্দ্র করে একটি নাম হয়েছে—সেটি নেতাজী মোড়। এই নেতাজী মোড়ের পূর্বনাম কলেজ মোড়। দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র কলেজকে (১৯৬৭) কেন্দ্র করে কলেজ মোড় নামটি হয়েছিল। আবার কয়েকবছর যদি পিছিয়ে যাই। তাহলে দেখব তার নাম ছিল-বাজার মোড়, অনেকেই আবার বেলদারপাড়া মোড় বলে চিহ্নিত করে থাকেন।

শোনা যায় জঙ্গীপুর মহকুমায় প্রথম নেতাজীর স্ট্যাচু করা হয়েছিল অরঙ্গাবাদ নিমতিতা হাইস্কুলের অদূরে। সেই প্রতিমূর্তি দেখে কলেজ মোড়ে নেতাজীর একটি স্ট্যাচু তৈরি করার অনুপ্রেরণা জন্মায়। নেতাজী মোড়ের সুভাষচন্দ্র বসুর যে স্ট্যাচু, সেটি নির্মাণ করেছিলেন যামিনী পাল নামে এক শিল্পী। যামিনী পাল তৎকালীন সময়ে বহুল পরিচিত নাম। বাড়ি বহরমপুর। জাতে কুমোর।

Scanned with CamScanner

নেতাজীর এই প্রতিমূর্তি বহরমপুরেই তৈরি করা হয়েছিল। স্ট্যাচুটি সেখান থেকে নিয়ে আসার পর কয়েকজন রাজমিস্ত্রি ও লেবার মিলে পরিপূর্ণ রূপদান করেছিলেন। রাজমিস্ত্রিদের মধ্যে ইউসুফ সেখ (বয়স ৮০+ চাঁদড়া), আলাউদ্দিন সেখ (মৃত, ডিহিগ্রাম), জসিমুদ্দিন সেখ (বয়স ৭৩+ ডিহিগ্রাম) এবং আরো অনেকেই যুক্ত ছিলেন।

স্ট্যাচুটি পরিপূর্ণরূপ দিতে সময় লেগেছিল চল্লিশ দিনেরও অধিক। স্ট্যাচুর নিচে প্রায় সাতফুট পর্যন্ত পিলার রয়েছে এবং মাটির উপরিভাগে পা থেকে হাঁটু পর্যন্ত দু'পায়ে দুটো মোটা আকারের রড রয়েছে। এই প্রতিমূর্তি নিমার্ণে ভূমিকা নিয়েছিলেন অত্র এলাকার বিড়ির মালিক, অল্প সংখ্যক ব্যবসায়ী এবং কিছু নেতাজী ভক্ত সাধারণ মানুষ। মূখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন আর.টি.পাল নামক বিড়ি কোম্পানির মালিক। অরঙ্গাবাদ শহরে এই বিড়ি কোম্পানীর অস্তিত্ব আজও বর্তমান। স্ট্যাচুটি পরিপূর্ণরূপ দিতে সিমেন্ট লেগেছিল প্রায় সাত বস্তা। সম্পূর্ণটাই মোজাইক পাথর দ্বারা নির্মিত। তৎকালীন সময়ে রাজমিস্ত্রিদের দৈনিক মজুরী ছিল নয় টাকা এবং লেবারদের তিন-চার টাকা। স্ট্যাচুটি এতটাই ভারী যে, মাটি থেকে পাঁচ ফুট উপরে তোলার জন্য ক্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঊনচল্লিশ বছর আগের সেই প্রতিমূর্তির অস্তিত্ব আজও বর্তমান। প্রতিবছর ২৩শে জানুয়ারি স্ট্যাচুটিকে ফুলের মালা পরানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ইত্যাদি কাজ করা হয়। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক দিনগুলোতেও পতাকা উত্তোলন করা হয়।

তথ্যদাতা :

(১) জসিমুদ্দিন সেখ, বয়স ৭৩+, অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ
(২) আব্দুল মাজেদ, বয়স- ৫৬+, অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ

Scanned with CamScanner

বেঁচে নেব আরও একদিন

—আরিফ আহমেদ
বি.এস.সি (প্রথম বর্ষ)

উড়ে যাক্ সব স্বপ্ন,
ভেঙে যাক্ সব স্মৃতির আগল,
ছিঁড়ে যাক সব মায়ার বাঁধন,
বেঁচে নেব, আরও একদিন
না পেয়েই তোকে।

ভুলিয়ে দেব, আলো-আঁধারিতে পাওয়া
তোর মায়াবি রূপকথার জগত,
ভুলিয়ে দেব তোকে।
বেঁচে নেব, আরও একদিন
না পেয়েই তোকে।

Scanned with CamScanner

কিছু কথা

—এম.এ খাবির
বি.এস.সি (প্রাণীবিদ্যা বিভাগ)প্রথম বর্ষ

কিছু কথা না বলাই থাক্,
থাক কিছু মার্শ গ্যাস
চাপা পড়ে পচা ডোবায়,
নইলে জ্বলে উঠবে আলেয়া
ঘটবে অযাচিত অপ্রত্যাশিত বিষ্ফোরণ
জানিনা মান - অভিমানের দৌড়ে
কতটা জিতেছিস তুই বা জিতেছি আমি,
শুধু এটুকু জানি,
তোর নিশ্চুপতা আমার অস্থিরতা,
তোর অবহেলা আমার মৃত্যু।
তাই সমস্ত বিকর্ষণ ভুলে
আকর্ষণের টানে, মুছে ফেলি আয়
সব রাগ-অভিমান, মনের ক্যানভাস থেকে
ভালোবাসার তুলির এক টানে।
আয়, বন্ধুত্বের নতুন করে সংজ্ঞা দিই
তুই আর আমি মিলে।
আয়, নতুন বন্ধুত্বে ভর করে,
উড়াল দিই,
খোলা আকাশে, খোলা পৃথিবীতে।

Scanned with CamScanner

"প্রকৃতি"

—দেবাশিস দাস
বি.এ প্রথম বর্ষ (বাংলা অনার্স)

হে প্রকৃতি, তুমি এত সুন্দর কেন?
তোমায় এত দেখি, তবুও থেকে যায় মনে আকুতি।
হে প্রকৃতি, তুমি এত শান্ত কেন?
তোমায় এত কথা বলি, তুমি তবু নিস্তরঙ্গ দিঘীর মত স্থির।
হে প্রকৃতি, তুমি এত উজ্জ্বল কেন?
তোমার এই মিষ্টি উজ্জ্বলতা দেখে
প্রাণময় হয়ে ওঠে চরাচর।
হে প্রকৃতি, তুমি এত কি ভাব নিজ মনে?
যখনই দেখি তখনই থাক চুপচাপ,
মনে হয় কিছু ভাবছো।
হে প্রকৃতি, তোমার এত রূপ কেন?
তোমার রূপ দেখে মুগ্ধ হয় না,
এমন কেউ নেই এই পৃথিবীতে।

Scanned with CamScanner

শিক্ষার মানোন্নয়নে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক

—প্রিয়াঙ্কা দাস, বি.এ, প্রথম বর্ষ (বাংলা অনার্স)

শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক; যার দ্বারাই ঘটে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন। এই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক রূপী পরিবারের সদস্য হল যথাক্রমে ছাত্র ও শিক্ষক। আর এই পরিবারের বন্ধন পবিত্র ও কালিমালুপ্ত যা নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় বাঁধা। শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক এমনই এক সম্পর্ক যা গভীর আত্মোপলব্ধির দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই আত্মোপলব্ধি অধ্যাত্মিক। এই আধ্যাত্মিক সম্পর্কের বন্ধনরূপী সুতোটা সমস্ত সম্পর্কের বন্ধন সুতোর থেকে অনেক মোটা ও শক্ত। ফলতঃ হালকা হাওয়া বা দমকা ঝড়ে তা ছিঁড়ে যায় না। এই বন্ধেনে আবদ্ধ শিক্ষককে শিক্ষার মানোয়নের ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা পালন করতে হয়। শিক্ষককে সুন্দরভাবে পালন করতে হয় তার দায়িত্ব ও কর্তব্য ছাত্রছাত্রীদের জীবনকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে তোলার জন্য। শিক্ষক শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ 'TEACHER'। এই শব্দটিকে টুকরো টুকরো করে নিয়ে প্রত্যেকটি লেটারের অন্তঃমধ্যে একজন শিক্ষকের কী কী গুন প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে তা দেখানো হল—'T'-Talented (শিক্ষিত ও গুণী), 'E'-Eligible, 'A'-Affectionate (স্নেহশীল), 'C'-Calmest (শান্ত), 'H'-Helper (সাহায্যকারী), 'E'-Exhoratative (পরামর্শদায়ক), 'R'-Rectifier (সংশোধক)। শিক্ষার মানোন নয়ন ঘটাতে হলে শিক্ষককে এই সব গুলো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। এইসব বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটিরও অভাব ঘটলে শিক্ষকতার দায়িত্ববোধ থেকে বিরত হবে। ফলত শিক্ষার মানের অবনতি ঘটবে। একহাতে যেমন তালি বাজেনা ঠিক তেমনি শুধু শিক্ষকের আলস্যের কারণে নয় ছাত্রদের জন্যও শিক্ষার মানের অবনতি ঘটতে পারে। শিক্ষার উন্নয়ণের জন্য যেমন শিক্ষককে অগ্রবর্তী হতে হবে তেমনি সহযোগিতা করতে হবে ছাত্রদেরও। এই জন্য ছাত্রদের কতকগুলি গুণ থাকা প্রয়োজন। এই গুনগুলি 'ছাত্র' শব্দের ইংরেজী

Scanned with CamScanner

প্রতিশব্দ 'STUDENT' শব্দটির বর্ণ বিশ্লেষনের দ্বারা বোঝানো হল- 'S'-Simple (সরল), 'T'-Talented (প্রতিভাবান), 'U'-Unafraid (নির্ভীক), 'D'-Disciplinarian (নিয়মানুবর্তী), 'E'-Etiquette (আদব-কায়দা সম্পন্ন), 'N'-Non Smoker (ধূমপানহীন), 'T'-Tolerant (সহনশীল), ছাত্ররা এইগুণগুলির মধ্যে বেশিরভাগই পেয়ে থাকে পাঠাশালাতে এসে। অন্যদিকে শিক্ষকের সুমার্জিত ব্যবহারও প্রদর্শিত হয় পাঠশালাতে। ফলশ্রুতিতে পাঠশালা হয়ে ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যম। কোনো শিক্ষক যখন নতুন পাঠাশালায় আসে তখন পাঠশালা ও তার নিয়ম শৃঙ্খলা তার কাছে অজ্ঞাত থাকে। কিন্তু ছাত্রের বিনম্র ও ভদ্র ব্যবহার তাঁকে নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, কোনো ছাত্র যখন নতুন পাঠশালায় আসে তখন শিক্ষকও তাকে পাঠশালার সদস্য হিসাবে গ্রহণ করে। ফলত গড়ে ওঠে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের ভিত্তি। ফলস্বরূপ শিক্ষার মানেরও উন্নতি ঘটতে থাকে। কিন্তু যদি শিক্ষক শুধুমাত্র বেতন পাওয়ার জন্য শিক্ষকতা করেন, ছাত্রের সঙ্গে পিতা-মাতার মতো ব্যবহার না করেন, বন্ধুর মতো তদের মনের কথা না জেনে একঘেঁয়েমি ব্যবহার করেন, ছাত্রদের জীবনপথে এগিয়ে যাবার জন্য উৎসাহ দিতে ব্যর্থ হন, সঠিকপথে ছাত্রদের চালিত করতে অসমর্থ হন, তাহলে শিক্ষকের ব্যর্থতায় ভাঙন ধরবে ছাত্র-শিক্ষকের পবিত্র সম্পর্কে। আবার, কোনো কোনো শিক্ষক নিজের জীবনে অপকর্মের প্রয়োগ ঘটিয়ে ছাত্রদের সঠিককাজে ব্রতী হবার জন্য উপদেশ দেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো শিক্ষক নিজের মাতাপিতাকে বাড়িতে স্থান না দিয়ে ছাত্রদের উপদেশ দেন তা না করার কিংবা নিজে পাঠশালার কোনো স্থানে বা শ্রেণিকক্ষে ধূমপান করে ছাত্রদের উপদেশ দেন ধূমপান না করার। এক্ষেত্রে শিক্ষকের উপদেশ ছাত্রদের নিছক জ্ঞান দান বলে মনে হয়। তাই শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটাতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শিক্ষকের হিতাহিত জ্ঞান থাকা। কোনো ছাত্র যদি শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়, বন্ধু ভেবে শিক্ষকের প্রতি নানা কু-সম্বোধন করে, নিয়ামানুবর্তী না হয়, শিষ্টাচার না দেখায়, তবে শিক্ষার অবনতি ঘটবে। তাই শিক্ষার মানোন্নয় ঘটাতে হলে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়কেই এমন

Scanned with CamScanner

কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে যাতে তাদের সম্পর্কের বিচ্যুতি ঘটে কিংবা অবণতি ঘটে।

মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হল সকলের সঙ্গে সমন্বয়সাধন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মানুষ এই গুণের অপব্যবহারই বেশি করে। ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। এর ফলে বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রগুলি ধর্মের ও রাজনীতির আখড়া হয়ে উঠেছে। এইসব চলতে থাকলে ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক বলে কোনো সম্পর্কই হয়তো পৃথিবীতে থাকবে না। এই সম্পর্কের অস্তিত্ব নিয়ে তখন পড়বে টানাটানি। তাই শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কেই হতে ধর্মনিরপেক্ষ। তা না হলে শিক্ষক হিন্দু হলে মুসলিম ছাত্রের প্রতি কটুবাক্য ও কু -দৃষ্টি এবং মুসলিম শিক্ষক হিন্দু ছাত্রের প্রতি কটুবাক্য ও কু-দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। ফলশ্রুতিতে কেউই প্রকৃত শিক্ষক বা ছাত্র হতে পারবে না। আর এর ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের সুতো ছিঁড়ে যেতে বাধ্য হবে। শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটাতে হলে এর উপর কখনোই ধর্মের প্রভাব পড়তে দেওয়া যাবে না। পাঠশালার সদস্যদের একটাই স্লোগান উচ্চস্বরে বলতে হবে-'আমরা হিন্দু নয়, মুসলিম নয়, নয় কলহ রাজ/কেউ বা ছাত্র কেউবা শিক্ষক এটাই আমাদের পরিচয় আজ।' আজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের মধ্যে রাজনীতি প্রবেশ করেছে। ফলত এই সম্পর্কের আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হয়েছে। শিক্ষক মন্ডলীর প্রায় অধিকাংশই রাজনৈতিক শক্তির কুক্ষিগত হয়ে নিজের দায়িত্ববোধকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। এর কুপ্রভাব পড়ে গরীব ও ক্ষমতাহীন ছাত্রদের উপর। আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন ক্ষমতার প্রভাবে অযোগ্য হয়েও যোগ্যতার মর্যাদা পায়। এই রকম চলতে থাকলে ছাত্র ও শিক্ষকের পবিত্র সম্পর্ক নষ্ট হয়ে তা ক্রমশ শিক্ষার অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতিকে টেনে না নিয়ে এসে শিক্ষকদের নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

শিক্ষার মান উন্নয়নের এক হাতিয়ার হল ছাত্রদের শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ; যা ছাত্র ও শিক্ষক সম্পর্কের মূল ভিত্তি ভূমি। শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ ছাত্রদের মধ্য থেকে অবলুপ্ত হতে চলেছে। আর সেই শূণ্যস্থান ভরাট হচ্ছে উচ্ছৃঙ্খলতায়। এখনকার দিনে ছাত্রদের মন থেকে শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রায় আসেই না বললেই চলে। কিন্তু আগেকার দিনে ছাত্ররা শিক্ষকদের প্রতি

Scanned with CamScanner

মন থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করত। বর্তমানে এই বিষয়টি পুরোপুরি অবলুপ্তি না ঘটলেও শিক্ষক ও ছাত্র সম্পর্কের মধ্যে একটা অদৃশ্য ফাঁক সৃষ্টি হয়ে গেছে। ছাত্র ও শিক্ষক সম্পর্কের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল 'শিক্ষক দিবস' পালন। এই উৎসব ছাত্ররা শিক্ষককে আনুষ্ঠানাকিভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ও সম্মান জানায়। কিন্তু বর্তমান উচ্ছৃঙ্খলময় যুগে দাঁড়িয়ে তারা শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন না করে সম্মান জানানোর একমাত্র উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে সস্তা মনোরঞ্জনকে। তাই ছাত্রদের উচিত যুগরুচির সঙ্গে তাল দেওয়ার সাথে সাথে শিক্ষকের প্রতি তাদের সম্মান জানানোর দিকটিরও প্রতি লক্ষ্য রাখা। নচেৎ ছাত্র ও শিক্ষকের সমধুর সম্পর্ক বিনষ্ট হবে। এর ফলশ্রুতি হিসাবে শিক্ষার মান উন্নয়ন ব্যাহত হবে।

মানুষের জীবন ধারণের এক অন্যতম রসদ শিক্ষা। আর এই শিক্ষার মানোন্নয়নে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক গভীর ভাবে প্রভাব ফেলে । ছাত্র ও শিক্ষক সম্পর্ক সুন্দর ও সুস্থিত হলে শিক্ষার উন্নতি ঘটবে। অন্যদিকে সম্পর্ক মন্দ হলে শিক্ষার অবনতি ঘটবে। তাই শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যাবশ্যক।

::::::::::::

Scanned with CamScanner

বিদায়

—মানজারুল ইসলাম
বি.এ (তৃতীয় বর্ষ) বাংলা অনার্স

বিদায় আমায় দাওগো কলেজ
বিদায় আমায় দাও।
শেষ বছরে যাচ্ছি চলে
নমস্কার আমার নাও।
প্রথম যখন আসি আমি,
তোমার হৃদয় মাঝে।
কত আনন্দ, কত চিন্তা,
মনের মধ্যে বাজে।
প্রথম বছর নবীন বরণ হবে শুনে
মনে হাসি পাই।
বরণ যখন হচ্ছে দেখে
খুশির সীমা নাই।
পুজোর সময় আসত যখন
যত ছাত্রের দল
কেউ বাজাত বাঁশি আর
কেউ কাটত ফল।।
সেসব স্মৃতি রইলো তোলা
মহাকালের ঘরে।
অনেক অনেক ভালোবাসা
ভাইবোনদের তরে।।

Scanned with CamScanner

অভাগীর সুখ

—কেয়া দাস
বি.এ তৃতীয় বর্ষ (বাংলা অনার্স)

গ্রামের শেষ প্রান্ত, যেখান থেকে শুরু হয়েছে
বিস্তীর্ণ ক্ষেত, সেইখানে পিটালি গাছের তলায়
ভাঙ্গা কুটিরটিতে থাকে এক বৃদ্ধা।
গায়ে একখানা ছেঁড়া, ময়লা কাপড়
কোনো ক্রমে জড়ানো, মাথায় রুক্ষ চুল।
জনালোক থেকে সে দূরেই থাকে।
কুটিরটি আধখানা পড়েছে,
তারই ফাঁক দিয়ে দেখা যায়-
ভাঙ্গা প্লাসটিকের বালতি, একখানা থালা,
উনুনের পাশে ছাই এর গাদা, ইঁদুরে তুলেছে মাটি,
পিটালির পাতা আর ফল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পড়ে,
ক্ষেত থেকে চুরি করে আনা লঙ্কা আর দুটো বেগুন,
শিশিতে অল্প তেল আর একখানা জীর্ণ চাদর,
পাশেই পড়ে আছে দু-একটা মদের বোতল-
তার মাতাল স্বামীর।
কখনও কখনও বুড়ো আসে ঘরে,
মদ খেয়ে পড়ে থাকে রাস্তায়।
কখনও বা বুড়ির হাতে দিয়ে যায় কিছু টাকা।
দু'দিন থেকে আবার সে উধাও।
রেশনের সস্তা চালে দিব্যি তার দিন চলে যায়।

Scanned with CamScanner

সেই ভাঙা ঘরে আছে পুরনো একটা চৌকি।
যখন সে ঘুমোতে যায় রাতে,
মনে মনে মহাসুখে ভাবে-যেন সে রাজ্ঞী
কারণ সে যখন এসেছিল বালিকাবধূ হয়ে,
সে দেখেছিল তারিণী ঝি মাটিতে ঘুমায়।
তারপর তো তার মাতাল স্বামী ভিটেমাটি বিক্রি করে
কুঁড়ে পেতেছে এইখানে।

সে থাকে একা, একটা ফাল্গুনের দক্ষিণা হাওয়া
যেন বইতে থাকে সর্বদা তার মনের মধ্যে।
তিনকালে গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আর কটা দিন।
সে যেন আর না জানে তার করুন দশা, জানে সে রাজ্ঞী
আর এই 'জানাটুকু' নিয়েই যেন কেটে যায়, তার অনন্ত জীবন।

::::::: *** ::::::::

Scanned with CamScanner

আলো ও আবছায়া

— বিপাশা গোস্বামী (প্রাক্তন ছাত্রী)

(১)

অনেকদিন পর রূপসা একটা অবসর পেয়েছে, ছুটি ছাটা সে অন্যদের মত পায় বটে তবু কাজে লেপ্টে থাকার একটা আনন্দ আছে, রূপসা সেটা পলে পলে অনুভব করে, আজ রূপসা ও রনজয়ের একমাত্র মেয়ে শ্রেয়সীর জন্মদিন। আঠারো হল ওর। নরম সোফায় গা এলিয়ে, কোলে কুশন নিয়ে আরাম করে বসে আছে রূপসা। এই দিনটার অন্য একটা তাৎপর্য-ও আছে বটে, ত্রিশ বছর আগে এইদিন মানে তেইশে সেপ্টেম্বর দু-জন কুখ্যাত সমাজবিরোধীকে ধরিয়ে দেবার জন্য মাকে সম্মান জানাতে পুলিশ কাকুরা তাদের ঘরে এসেছিল। টালির চাল, মাটি লেপা একচিলতে ঘর, একদিকে একটা তক্তপোষ আর অন্যদিকে একটা নড়বড়ে বেঞ্চি, ঐ বেঞ্চিতেই বই খাতা রাখত রূপসা। বেঞ্চির বইখাতা তক্তপোষে সরিয়ে মা জায়গা করে দিয়েছিলেন তাদের বসার। তখন অবশ্য রূপসারা জানত না যে ওরা সমাজ বিরোধী। ইস্কুল যাওয়ার পথে ওরা রূপসার শাড়ি ধরে টানে, নোংরা কথা বলে। ভীতু রূপসা ভয়ে ভয়ে মাকে এসে জানায়। মা বলে, 'শুন বিটি তুই কাল মোর সাথে ইস্কুল যাসকেনে!'

'তুমি ওয়াদের কী করবা মা ? 'রূপসার গলায় ভয়!!

'হাঁসুয়া দিয়ে কুপায়, একেবারে জানে মেরে দেব,' চেনে না এই মিলি বাগদিরে, মায়ের চোখে আগুন।

পরদিন সত্যি-ই মা ওদের হাঁসুয়া নিয়ে তাড়া করে, মায়ের চিৎকারে সব গ্রামবাসী জড়ো হয়ে গিয়ে ধরে ফেলে ঐ শয়তানের বাচ্চা দুটোকে। মদনা আর নরুল, অনেক কেস ওদের নামে, ডাকাতি, সমাজবিরোধী কাজকর্ম, জালনোট থেকে সীমান্তে গরু পাচার সবকিছুই করে। তার উ পর দু-দুটো খুনের মামলায় দাগী আসামী। তবে ওরা ভিন গাঁয়ের। এই গাঁয়ে এসে গা-ঢাকা দিয়েছে।

এক সময় ওরা জামিনে ছাড়া পায়। 'মেয়্যাছেলা কিনা আমাদের ধরল মদনা ?

Scanned with CamScanner

নরুল বলে, 'ওয়াকে একবার, ধরতে পারি নরুল দা। জইনমের তেজ ঘুচায় দেব।' 'মায়্যামানুষের এতবাড়'! মদনা গাল চুলকাতে চুলকাতে বলে।

(২)

'মা, ওমা, কিগো?' সেই কখন থেকে ডাকছি, শ্রেয়সী বলে, বল মা ? 'একটু কাছে আসবি?' খুব নরম করে রূপসা মেয়েকে ডাকে।

সকালে দু-চামচ পায়েস খাইয়ে দিয়েছ জন্মদিন বলে, আর কিছু কি দেবে না জননী ? আমার কি কলেজ নেই নাকি ? নাকি ডোমকলের 'মাদার টেরিজা' রূপসাদেবীর মেয়ে শ্রেয়সী ব্যানার্জীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে কলেজ ছুটি? মেয়েটা একটানা বলে যায়।

'না, আগে কাছে আয়' রূপসা মিটিমিটি হাসছে 'না আগে বল!' শ্রেয়সীও ছাড়ার পাত্রী নয়।

"না মা জননী, তুমি বাবা আরাম এসে বসো। আমি তোমার আমার দুধ-কর্ণফ্লেক্স ডিম সেদ্ধ নিয়ে এসে বসছি" শ্রেয়সী চলে যায়।

মেয়েটাকে দেখলেই রূপসার তার অভাগিনী মা টার কথা বড্ড মনে পড়ে, এক-ই রকম নাক-চোখ-ঠোঁঠের নীচে তিল। তবে রংটা কালোই বটে, আর গড়পড়তা বাঙালি মেয়েদের থেকে বেশ লম্বা। সব মিলিয়ে একটা কালো ভোমরা যেন, ভারী মিষ্টি।

(৩)

আচ্ছা মা, যদি বাইশে সেপ্টেম্বর ঐ লোকদুটোকে না ধরত? ঠিক পরদিন তেইশে সেপ্টেম্বর যদি বাড়িতে পুলিশ সংবর্ধনা জানাতে না আসত? তবে হয়তো ঐ ঘটনা ঘটত না। এখনো শিউড়ে ওঠে রূপসা। বুকের কুশনটা আরো জোরে চেপে ধরে। সেদিন পুলিশ কাকুরা মাকে বলেছিল।

'আপনি আমাদের অনেক উপকার করেছেন ম্যাডাম, আপনি এই গ্রামের গর্ব, কিছু সাহায্য লাগবে বলবেন কিন্তু।'

মা ছিল সম্পুর্ণ অন্যরকম, গরীব ছিল, কিন্তু আত্ম সম্মানের খামতি ছিল না,

Scanned with CamScanner

বরং ছিল আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।

মা বলেছিলেন, "আপনেরা হইলেন বড়ামানুষ, আমাদের দ্যাশ, গাঁ চালান, কত কিছু করেন বাবু আপনারা, তাই বুলছিলাম বাবুরা, দ্যাখবেন যেন গাঁ-ঘরের বিটিছেলারা ডর না করে ইস্কুল-পেরাইভেট যেতি পারে। মায়া মানুষের প্রতি পদে বিপদ, সীমান্তের গেরাম তো বাবু, মায়া গুলান বড় ডরে থাকে। ছেলাগুলান যে বড্ড জ্বালায়। সাঁঝে তো ঘরে থাকতেই ভয় পাই বাবু। দ্যাখবেন তো বাবু মায়াগুলারে?"

মায়ের ছলছলে চোখ আজও ভুলতে পারে না রূপসা। বুকে গাঁথা কাঁটাটা বোধ হয় আর সরবেনা! সেদিন উত্তরে পুলিশ কাকুরা বলেছিলেন,

'খারাপলোক অনেক ম্যাডাম, আর আমরা মাত্র কজন, চেষ্টা করব ম্যাডাম, এ টুকু বলতে পারি', বলে একটা বড় মিষ্টির প্যাকেট উনারা মায়ের দিকে এগিয়ে দেন, মা বলেন, "বাবু, আর এটু বসে যান, আমরা গরীব গাঁ ঘরের মুখ্যু-সুখ্য মানুষ, মিষ্টি তো তেমন জুটেনা। এই মিষ্টি সব্বার জন্য লিয়ে আসি বাবু। পথমবার এলেন আর মুখে কিছু দিবেন না!"

একটা কলাই করা থালায় মা সব মিষ্টি গুলোই নিয়ে এসেছিল সেদিন, বাড়ীর পুলিশ দেখে উঁকিঝুঁকি মারছিল অনেকেই। মিষ্টির ভাগ থেকে বাদ পড়েনি তারাও।

একজন পুলিশ ক্যামেরায় ছুবিও তুলেছিল রূপসার মনে আছে। ও আব্দার করেছিল, 'ও কাকু আমারে এক কপি দিও না!' ওনারা কথা রেখেছিলেন।

(৪)

"এই যে 'মাদার ইন্ডিয়া' খাবারগুলো খাও দয়া করে, আমার কিন্তু কলেজ আছে।" বলেই খাপাখপ খেতে লাগে শ্রেয়সী।

মেয়ের মাথা, গায়ে ভাল করে হাতবুলিয়ে দেয় রূপসা, কোনমতে চামচটা বাটিতে রেখেই বেসিনে মুখটা ধুয়ে নেয়, বলে, 'আসছি মা।"

"সাবধানে যাবি, আর চেষ্টা করবি সন্ধ্যের আগে ফেরার।"

Scanned with CamScanner

রূপসা বলে,

'দুর-মা, রোজ এক কথা, কি হয় এসব বলে, পায়ে জুতো থাকে মা, দেব না এমন.....,

"মা বলেছিল হাঁসুয়া, মেয়ে বলছে জুতো" আপনমনে হেসে ফেলে রূপসা।

(৫)

মা আমি কিন্তু মদনা আর নরুলরে ঘুরঘুর করতে দ্যাখছি ওরা কিন্তু জামিন পাইছে মা,

রূপসা বলে,

"ডরাসনা বেশি, কাম করতিদে মোরে।" গোবর দিতে দিতে মা বলে,

অবশেষে এল ঊনত্রিশ সেপ্টেম্বর পরের বছর, মাধ্যমিকের টেস্ট চলছিল, সেদিন-ই ছিল শেষ দিন, অঙ্ক পরীক্ষা, মার হাতে পাঁচটা ট্যাকা দেছিল। বলেছিল, 'ফুচকা খেয়ো কেনে বিটি।"

বন্ধুদের সাথে আনন্দ করে ফুচকা খেয়ে বাড়ী ফিরছিল রূপসা, বাড়ির সামনেটায় ভীষণ ভিড়, পুলিশ ছয়লাপ চারধার।

কি হইসে কাকু ? কাঁপা গলায় রূপসা বলে,

তোমারমা আর নেই, উনি বলেন।

ধপ করে বসে পড়ে রূপসা, হাতে-পায় বল নাই, চোখের মনি নড়ে না, তার সামনেই বাঁশের বাতা থেকে মায়ের ঝুলন্ত দেহটা নামান হয়, হয়তো রূপসা কিছু বলতে চেয়েছিল, ঠোঁটটা থরথর করে কেঁপে ওঠে, খর্খর শব্দ হয় বুকে, বলা হয়ে ওঠেনা কিছুই, বাপ সেতো ভিন্ রাজ্যে কাজ করে। দুইটা গরু আছে গোয়ালে, তারা সমানে ডেকে চলেছে। যেন ওদের বোঝা ভাষা দিয়ে কত কিছু বলতে চায়।

Scanned with CamScanner

এরপর দ্রুত ওলটাতে লাগে ক্যালেন্ডারের পাতা, মায়ের পোষ্টমর্টেম হয়, সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট, প্রাণ পনে যুদ্ধ করেছিল মা, আর আত্মহত্যা নয়, খুন। দাহ হয় শ্বশানে। রূপসাই মুখে আগুন দেয়, এই তো পরশু-ই মায় পাঁচটা ট্যাকা দেছিল। কত আহ্লাদ করে বলেছিল, "ভালা তো কিছু দিতে পারি না মা, ফুচ্কা খাস।"

আর আজ মায়ের সারা শরীরটা জ্বলছে, ধোঁয়াটা ক্রমশ কুন্ডলী পাকিয়ে ওপর দিকে উঠতে থাকে।

(৬)

এরপর এক নিরন্তর লড়াই। অদম্য জেদ, পড়াশোনা আর বড় হওয়ার লড়াই। পুলিশ কাকুরা ওকে হোমে রেখে দিয়েছিল, তখন সমাজে তার একটাই পরিচয় 'ধর্ষিতার'র মেয়ে, ওর কানে এসেছে মদনা আর নরুল ধরা পড়েছে, মা বলত,

"বিটি গাঁ-ঘরে ডাক্তার নাই, তুর মাথা ভালো, তুই ডাক্তার হোস।"

মায়ের এই কথাগুলাকে সম্বল করেই বাঁচে রূপসা । কত স্বপ্ন ছিল তাঁর, কত ইচ্ছা ছিল। গাঁয়ের মেয়েরা নিরাপত্তা পাবে, গাঁয়ে ডাক্তার থাকবে। আসলে মাও তো গাঁয়ের ইস্কুলে কেলাস সেভেন অবধি পড়ে ছিল। না রূপসা ডাক্তার হতে পারেনি বটে , তবে নার্স হয়েছে। ডোমকলে সবাই ওকে রূপসা নামে একডাকে চেনে, একবার চাকরি পাবার পর নিজের গেরাম সাগরপাড়ায় গেছিল ও । বাপের মুখখান দ্যাখতে বড় সাধ জেগেছিল মনে, রাস্তাতেই শুনেছিল ওর বাপ আবার বিয়ে করেছে। দুটো ছেলে তার। লুকিয়ে লুকিয়ে ভিটেটা দেখিছিল, গরুগুলানরে দ্যাখে নাই। ওদের হাম্বা ডাক ও শোনে নাই। হয়তো বাপে সব বিক্রি করে খাইছে।

আজও যদি রূপসা শোনে সাগরপাড়া থেকে কেউ ডোমকল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ও নিজে এসে দেখা করে, কথা বলে। কখনও কখনও বাড়ির থেকে খাবার ও এনে দেয়। ওরা যে ওর 'একান্ত আপন'। মায়ের দেশের লোক।

Scanned with CamScanner

(৭)

রূপসার প্রথম জীবনটা খারাপ হলেও কিছু ভাল নিশ্চয়ই ওর জন্য তোলা ছিল। নার্সিং স্টাফ হিসেবে জয়েন করার বছর চারেকের মাথায় ওর একজন সৎ-চরিত্রবান ভালমানুষ স্কুল টিচারের সাথে বিয়ে হয়ে যায়। সম্পর্কের যোগসূত্র? হ্যাঁ এই হাসপাতাল। একদিন প্রবল শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে রণজয়ের বাবা হাসপাতালে ভর্তি হন। সাথে ছিল রণজয় আর ওর মা। প্রচন্ড বৃষ্টির সেই রাতে বারবার 'কল' দিয়েও জানান যায়নি ডাক্তারকে। রূপসা নিজেই ওনার মুখে অক্সিজনের মাস্ক লাগিয়ে দেন। ডেরিফাইলিন-ডেকাড্রন ইনজেকশন দেন ওনাকে। পালস আর বি.পি চেক করে। অবস্থা যখন অনেকটা আয়াত্তে তখন ও বাইরে বেরিয়ে আসে। রণজয়দের চিন্তা করতে বারণ করে। নাইট ডিউটি থাকলেই ও ফ্লাস্কে চা নিয়ে যেত, প্লাস্টিকের কাপে ওনাদের চা এগিয়ে দেয়। আর বাড়ি ফিরে যেতে বলে।

দিন দুয়েক পর রণজয়ের বাবা সুস্থ হলে, রেখা দেবী সরাসরিই বলেন—"তোমার মত একটি মেয়ে আমার ছেলের জন্য খুঁজছি রূপসা।"

'আমার মত?'-রূপসা অবাক, বলে, আমার সবটা জানলে আপনি কিন্তু এই কথা বলতেন না মাসিমা। পরে রূপসা ওনাকে সবটা জানায়, সবটা শোনার পর উনি বলেছিলনে, "মা রে, তুই তো খাঁটি সোনা, আমার সারাদিনই বই নিয়ে পড়ে থাকা ছেলেটাকে বিয়ে কর। তোরা খুব সুখি হবি।" তোর জন্য আমি আমার স্বামীকে ফিরে পেয়েছি। বুক জড়িয়ে ধরেন রূপসাকে ধূমধাম করে বিয়েটা হয়ে গেল রণজয়-রূপসার। তারপর শ্রেয়সী জন্মাল। ঘটনাচক্রে ওর জন্মদিনটাও তেইশে সেপ্টেম্বর। পুলিশ কাকুদের ওদের ঘরে আসার দিন, যেদিন মা তার যাবতীয় ইচ্ছের কথা ওদের উজার করে দিয়েছিলেন।

মা চেয়েছিল রূপসা ডাক্তার হোক। না ও পারেনি। তবে নার্স হয়েছে। আর ছেলেবেলা থেকেই শ্রেয়সী চায় যে ও পুলিশ হবে। মায়েদের ইচ্ছেগুলো হয়তো এভাবেই তার সন্তান-সন্ততিতে ছড়িয়ে পড়ে।

সোফা ছেড়ে ওঠে রূপসা, কুশনগুলো ঠিক করে রাখে। মায়ের সেই ছবিটা সুন্দর করে বাঁধান। ছবিটার সামনে দুটো ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেয় রূপসা, ধূপকাঠির গন্ধটা ঠিক মায়ের ছাইয়ের গন্ধের মত।

Scanned with CamScanner

সর্বনাশের পথে

—মানজুলা খাতুন
বি.এ তৃতীয় বর্ষ

সর্বনাশের পথে এখন চলছে যুবক দল
বয়সের ধর্ম এটা, বলে করছে তারা ছল।
ফুলের মতো জীবনটা, যেন ফুলের কলি
নিজে হাতে সেই জীবনকে করছো তোমার বলি।
নেশাটাকে তোমরা এখন বানিয়েছো ফ্যাশান
মনে করছো এতো তোমাদের বেড়েছে সম্মান।
ধূমপান এক মরণ ব্যাধি ক্যান্সারের কারণ
জেনে বুঝে করছো তোমরা, মৃত্যুকে বরণ।
জীবন নিয়ে তোমরা যারা খেলছো এখন খেলা
সামনে এসে হাজির হবে মরণেরই বেলা।
আসল চিনেও , নকল টাকেই করলে জীবন সাথী
আলো ছেড়ে গ্রহণ করলে অমাবস্যার রাতি।
তোমরাই তো কর্ণধার স্বাধীন দেশের ছেলে।
গৌরবিত যুবকরা আজ যাচ্ছে রসাতলে।
অমূল্য তোমার জীবন খানি সাজাও মনের মতো
বিষপান করে জীবনটাকে করোনা আর ক্ষত।
সময় থাকতে যুবকরা সব হয়ে যাও সাবধান
ভুলের মাঝেই হারাবে একদিন তোমার সুন্দর প্রাণ।
জীবনটাকে ভালোবাসো ত্যাগ করো কুপথ
থাকবে সদা আলোর মাঝে এটাই কর শপথ।

Scanned with CamScanner

মা হারা মেয়ে

—নিলুফা ইয়াসমিন
বি.এ দ্বিতীয় বর্ষ (বাংলা, অনার্স)

মা হারা লিমা কে দেখে বড়ো দুঃখ লাগে
মা যে তাঁর হারিয়ে গেছে, এই বলে সে কাঁদে।
স্কুলে সে প্রতিদিন-ই, টিফিনের সময়
সবার দিকে তাকিয়ে দেখে, মনে মনে কয়।
ঝুমা, সুমা, রুমার মাতো, প্রতিদিন-ই তাদের
স্কুলের টিফিন দেয়, ব্যাগের মধ্যে পুড়ে।
ওদের দেখে আমার মাগো, বড়ো ইচ্ছে জাগে
তোমার হাতের তৈরি টিফিন নিয়ে, যাই স্কুলেতে।
মাগো, রাতের বেলায় চেয়ে থাকি, ঐ আকাশের পানে
মা যদি মোর পৃথিবীতে, আসে তারার রূপে।
প্রতিদিন-ই রাতের বেলা, ঘুমানোর আগে
মাগো আমার তোমার কথা, বড়ই মনে জাগে।
মায়ের স্নেহ মায়ের আদর, মায়ের ভালোবাসা।
পেতে আমার মনেও জাগে, বড়ো উচ্চ আশা।

Scanned with CamScanner

সাধ

—আবিদা সুলতানা
বি.এ তৃতীয় বর্ষ

হঠাৎ একটা ইচ্ছা কেন
জাগলো আমার মনে ?
ছোট্ট একটা পদ্য দেব
কলেজ ম্যাগাজিনে।।
যেমন ভাবা তেমনি কাজ
খাতা কলম দিয়ে
লিখছি কেবল, কাটছি কেবল
মাথাটা চুলকিয়ে।।
মা বললে, খুব হয়েছে
খাবার খাবি আয়,
'কবি' হওয়া হলনা আর
এ জীবনে হায়।।

Scanned with CamScanner

পৃথিবীটা ভুগছে

—দেবজ্যোতি নন্দী
বি.এ দ্বিতীয় বর্ষ (ইতিহাস অনার্স)

পৃথিবীটা ভুগছে,
কখনও সন্ত্রাসবাদের বিরাট ঢেউয়ে,
কখনও মরণ রাত্রে ব্যাপক ধোঁয়ায়।
মহাকাশ রূপী,
বিশাল সমুদ্র বুকে ডুবিতে ডুবিতে
বাঁচছে বারবার তাঁর করুণার ছোঁয়ায়।
জানি একদিন—
পাপের ভার পূর্ণ হলে
বিশ্বরূপী টাইটানিক খাবে ধাক্কা
বিরাট হিমশৈলের সাথে,
চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে এই সাধের পৃথিবী।
কিয়ামতের সেই দিন আসবার সাথে সাথে।

Scanned with CamScanner

মায়াবিদ্ধ

—উইন রাজা
ইংরেজি অনার্স (দ্বিতীয় বর্ষ)

আলো আঁধারি রাতে দেখেছি তোমারে
সুমিষ্ট সুরে ডাকছো মোরে, 'ওরে সোনারে।'
দূর হতে তোমার ডাকে দিলাম আমি সাড়া,
ভালো কী থাকতে পারি, মাগো তোমায় ছাড়া।।
এই ভুবন ছেড়ে পাড়ি দিয়েছো অন্য ভুবনে
প্রার্থনা করি যেন তুমি থাকো নন্দনকাননে।।
হঠাৎ কাছে এসে বসলে আমার পাশে
মিষ্টি মিষ্টি কথা বললে ভালোবেসে।
হৃদয় তখন উচ্ছ্বসিত হয়ে নাচতে শুরু করলো
জীবনের সব জ্বালা যেন জুড়ালো।
সহসা বাতাসে অদৃশ্য হয়ে কোথায় তুমি গেলে
ক্ষণিকের দেখা দিতে কেনই বা এলে।
অস্থির মন বলে তখন আর একটিবার দেখা দাও
মা
ছিল কী এটা কোনো মায়া, নাকি আমার কল্পনা।।

Scanned with CamScanner

LIFE

Md. Monirujjaman
Ex-Student (Hons. in English)

What's a life ?
A river alike
Runs towards its source
Being ignorable of its course

What's a life ?
A boat alike
Floats on the water
The soul being its driver.

What's a life ?
A tide alike
Sometimes be in its height
Sometimes in its quiet.

What's a life ?
A leaf alike
Riched in hue, finely dressed
Hints at soon to be shed.

Scanned with CamScanner

What's a life ?
A flower alike
Bloomed with fragrance or only with beauty
Like an adept artisan drops off after performing its duty.

What's a life ?
A fruit alike
Commernces to ripen
Implaying implicitly to be falled.

What's a life ?
A candle alike
Gradually begins to melt
Both wormth and heat being felf.*

What's a life ?
A bowl alike
Be full of passion, pride and prejudice
But empty of perfect peace.

What's a life ?
A tale alike
Abounds with fantasy enchanted
of Which rarely being actuated

Scanned with CamScanner

What's a life ?
A bubble like
Covers its layer with air
Knowing not when to be bare.

What's a life ?
A flame alike
Makes its flare
After predestined time only to be blear.

What's a life ?
An art alike
The presentation of one's reflexion
Depends on one's choice of decoration.

What's a life ?
A tamed parrot alike
Performs that act
What's actually tought.

What's a life ?
A true-actor alike
Rewards and retributions, name and fame geth
In most cases, after or near one's death.

Scanned with CamScanner

What's a life ?
A dog's tail alike
Instanity being crooked
As soon as it's loosed

What's a life ?
A river alike
Brims with water with ripple
But sometimes with little.

What's a life ?
A compass alike
Begins its journey according to the prediction
Ultimately making a zero without prefection.

Scanned with CamScanner

দুটি কবিতা

—রুবিদা খাতুন
বি.এ দ্বিতীয় বর্ষ (বাংলা, অনার্স)

(১)

পণ

মেয়ের বাবা মধ্যবিত্ত রফিক সেখ তার নাম,
নিবাস তার এই বাংলার কোন একটি গ্রাম।
ছেলের বাবা মোবারক সেখ বলেন একটু হেসে,
খানাপিনা বেশ ভালোই হল আপনার বাড়ি এসে।
মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে লাগবে কিছু পণ,
সেসব কথা বলছি একটু শুনুন দিয়া মন।
লাখ খানেক নগদ দিবেন ভরি দশেক সোনা।
ঘড়ি, আংটি, খাট, বিছানা এতো সবার জানা।
মোটর বাইক দেবেন একটা জামাইয়ের কথা ভেবে,
বেয়ান আপনার ভীষণ জেদি ফ্রিজ একটা নেবে।
আলমারি যে দেবেন একটা সন্দেহ নেই তাতে,
আশা করি, টিভি দেবেন দেখতে রাতে।
বরযাত্রী মাত্র দুশো আসবে বরের সাথে,
মাছ-মাংস, পোলাও-কাবাব দেবেন তাদের পাতে।
মনে রাখবেন বিয়ের আগে নগদ পাওনা নেব,

Scanned with CamScanner

সকল কিছু বুঝে নিয়েই বিয়াতে মত দেব।
এসব শুনে রফিক সেখের বুকে ধরফড় করে,
পায়ের তলার মাটি যেন তার কোথায় গেল সরে।
দিন দুপুরে হঠাৎ এমন কেন হল তাঁর,
চতুর্দিকেই দ্যাখেন শুধু ঘন অন্ধকার।
জামাই সেজে ডাকাত এসে কেড়ে নিতে চায় সব,
প্রতিবাদের ভাষা কোথায় সবাই যে নীরব।
ছেলে বেচা স্বভাব যাদের তারা গলায় দড়ি দিক
এতে যারা সম্মতি দেয় তাদের শত ধিক।

(২)

শেষ খেয়া

যখন আমি বিদায় নেব,
এই পৃথিবী হতে ।
চোখের আলো আঁধার হবে,
কাঁদবে আমার শোকে।।
ডাকবে নাকি তুমি মোরে,
আমার প্রিয় নামটি ধরে ?
শুধুই কেঁদে আকুল হবে,
আমায় বুকে রেখে।।
খুঁজেই তুমি পাবে না আর,
কোথাও আমার নিকট দূরে।

Scanned with CamScanner

আমি তখন হারিয়ে যাবো,
তোমার থেকে অনেক দূরে।।
হারানো দিন মনে পড়ে,
যদি চোখে অশ্রু ঝরে।
তখন তুমি তাকিয়ে দেখো,
ভোরের তারাটিকে।।

Scanned with CamScanner

আদর্শ মানুষ হওয়ার আহ্বান

— অসিকুল আলম, বি.এ, প্রথম বর্ষ (ভূগোল অনার্স)

পৃথিবীর সূচনাকাল থেকে বহু সময়, সেই সঙ্গে বহু মানুষ অতিবাহিত হয়েছে। বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তাঁদের মধ্যে অনেক ছিল বিভিন্ন ধর্মের। তাছাড়াও বিভিন্ন মতবাদ, বিভিন্ন আদর্শ ও বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত। আমরা যদি দেখি এই জগৎ সংসারে পুরুষ মানুষই প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানে, নৈতিকতা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা যেমন পুরুষের, তেমনি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে, অরাজকতা ও দুর্নীতি প্রসার, সকল প্রকার দুর্ঘটনা ঘটাতে পুরুষের ভূমিকাই অত্যাধিক। পরিবারের প্রধান হিসাবে পুরুষ যদি ভালো হয়, তাহলে পরিবার ভালো চলে। পরিবারের সদ্যরাও ঠিক থাকে। অন্যদিকে পরিবারের পুরুষ যদি খামখেয়ালি ও দুর্নীতি পূর্ণ হয় তাহলে তার পরিবার ও পরিবারের সদস্যরা ভালো থাকে না। সংসারে লেগে থাকে অশান্তি, কলহ-বিবাদ। ঈশ্বর পৃথিবীতে নারী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন 'তাঁর বান্দেগী ও ইবাদাত' করার জন্য। কিন্তু নারী-পুরুষের সৃষ্টি কৌশলে অনেক তারতম্যে রয়েছে। এই জন্য যে, একে অপরের মাধ্যমে তারা উপকৃত হবেন। আমরা যদি দেখি যে শক্তি সামর্থ্য পুরুষের বেশী এমন কী বুদ্ধিমত্তায় ও পুরুষ অগ্রগতি। এই পৃথিবীতে মানুষ আদর্শ মানুষ রুপে নিজেকে গড়ে না তুলতে পারলে এই পৃথিবীতে মানুষ আদর্শ মানুষ রুপে নিজেকে গড়ে না তুলতে পারলে এই পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারে না। বজায় থাকতে পারে না স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা। আমরা আদর্শ মানুষ রুপে গড়ে উঠতে না পারার কারণে বর্তমানে পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা দূরীভূত হয়েছে। এই জন্যই সর্বত্রই হানাহানি, খুনোখুনি বিরাজ করছে। এই অরাজকতা থেকে মুক্তি পেতে হলে মানুষকে মহান ঈশ্বরের পথে অগ্রগামী হতে হবে। তাছাড়াও পৃথিবীতে যে শত শত মহান ব্যক্তিত্ব, আদর্শবান মানুষ, মহান ঋষি এসেছেন, তাঁদের জীবনীকে ভালো ভাবে রপ্ত করে নিজেদের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনতে হবে। তাহলে পৃথিবীর যাবতীয় অশান্তি, অরাজকতা দূরীভূত হবে। ফিরে আসবে শান্তি ও স্থিতিশীলতা। পৃথিবীর সর্বত্র সমান না হলেও অন্তত আগে নিজের

Scanned with CamScanner

দেশের হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাহলে তাদের নিজের জীবনে এবং দেশ, জাতি ও পৃথিবীর মধ্যে ফিরে আসবে শান্তি, ফিরে আসবে নিরাপত্তা। আমরা যদি ইতিহাসের পাতা খুলে দেখি পৃথিবীতে মহান ব্যক্তি গুলির আদর্শ, অনুপ্রেরণা, মানব প্রেম, ভক্তি, ভালোবাসা দিয়ে তারা কীভাবে পৃথিবীতে শান্তি বজায় রেখেছে। ভালোবাসা দিয়েছে এমনকী রাস্তার প্রাণী ও অন্যান্য জীবদেরকেও। তাঁরা পৃথিবীতে যেভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে সেভাবে আমরা যদি তাঁদের পথকে অনুসরণ করি, তাহলে আমরাও আনতে সক্ষম হব স্বচ্ছ দেশ তথা স্বচ্ছ পৃথিবী। আমরা যদি দেখি যে মহম্মদ (সাঃ), বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ কীভাবে মানুষের প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা দিয়ে গেছেন। তাছাড়াও গুরু নানক, গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর জৈন পৃথিবীতে নানান ধর্মের মহান ব্যক্তিরা কীভাবে পৃথিবীতে ভালোবাসা দিয়ে গেছেন, দিয়ে গেছেন মানুষকে, দিয়ে গেছেন জীবকে। এই সব মহান ব্যক্তির জীবনী ও বাণী আমরা সর্বত্রই শুনি ও বলে থাকি যে তাঁরা খুব ভালো মানুষ ছিলেন, পৃথিবীকে ভালোবাসা দিয়ে গেছেন। কিন্তু আমরা সেই প্রেম, ভালোবাসা পৃথিবীতে কীভাবে বিরাজ করবে সেই চেষ্টা করাতে পারি না। আমাদেরকে সজাগ হতে হবে আদর্শ মানুষ রুপে নিজেকে গড়ে তুলে নিজের সমাজ থেকে শুরু করে নিজের দেশ, নিজের পৃথিবীর মানুষকে কীভাবে ভালোবাসা, ভক্তি, প্রেম, স্নেহ দেওয়া যায়, দেওয়া যায় হাসি, মেটানো যায় কান্না, সেই চেষ্টা করতে হবে। আমরা যদি সেই চেষ্টা থেকে বিরত থাকি তাহলে আমরা কীভাবে নিজেকে গর্বিত বলে দাবি করতে পারি যে আমি একজন ভালো মানুষ। তুমি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হলে কী হবেযদি সেই শিক্ষা কাজে না লাগে প্রাণীর জন্য। তাহলে তোমার শিক্ষা তোমার কাছে রইল, তুমি পাবে না সহমর্মিতা, পাবে না ভালোবাসা। আর তুমি সেই মহান ব্যক্তির কথায় অনুপ্রানিত হয়ে হতে পারলে না তো একজন আদর্শ মানুষ। আদর্শ মানুষ হওয়া যায় তখনই, যখন তুমি তোমার শিক্ষাকে প্রয়োগ করে দেখাতে পারবে জন সমক্ষে। আর সেই সব মানুষ মহান ব্যক্তির কাছে ঘৃণিত, যারা নিজের পেট পূর্ণ করে খায়, এবং নিজের প্রতিবেশী অনাহারে খালি পেটে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বলতে থাকে, হে ঈশ্বর আমাদের মরণ কবে হবে। আমরা যদি প্রতিবেশীর খবর না নিয়ে থাকি তাহলেও আমরাও একজন

Scanned with CamScanner

আদর্শ মানুষ রুপে গড়ে উঠতে পারবোনা। তাই পরিশেষে বলা যায়, আমরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমাদের দেশ তথা সমগ্র পৃথিবীতে নিয়ে আসতে পারি শান্তির বাণী ও নিরাপত্তা, তবেই আমরা আদর্শ মানুষ রুপে পৃথিবীতে স্থান পাবো, পাবো ঈশ্বরের কাছে প্রতিদান। আমরা মানুষের প্রতি সহনশীলতা, সহমর্মিতা, ভালোবাসা দিয়ে পৃথিবীতে কায়েম করব শান্তি ও মানবতা। এই আশা যেন থাকে মনে। নইলে আমরা দাবি করতে পারবোনা আমি একজন আদর্শ মানুষ। আমাদের লক্ষ্য থাকবে পৃথিবীকে নির্মল ভাবে গড়ে তোলার। আমরা যদি সেই চেষ্টায় রত থাকি তাহলে আমরা দূষিত পৃথিবীকে নির্মল পৃথিবীরূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হব। আর এই চেষ্টার ফল হবে স্বচ্ছ, নির্মল ভারত তথা, স্বচ্ছ নির্মল পৃথিবী।

:::::::::

Scanned with CamScanner

রহস্য ??

— সাদিক আনোয়ার (বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ)

মেয়েটা খুব শান্ত ভাবে টিস্যু দিয়ে চোখ মুছে আমার চোখে চোখ রেখে বললো "বন্ধু, আমি প্রেগন্যান্ট"। আমি তখন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে গিয়ে জিভ পুড়িয়ে ফেলেছি, রিঙ্কির কথাটা আমার কানে ঢুকলো না। আমি ব্যস্ত ভঙ্গিতে পানির গ্লাসে চুমুক দিতে গেলাম, রিঙ্কি আমার কাঁধে আবার ঝাঁকি দিয়ে বললো "আমি কি বলছি শুনেছিস?"

আমি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম 'কি'?

সে একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বললো "আমি দুই মাস ধরে কনসিভ করছি, আমার ভিতরে সেলিমের সন্তান"। আমি রিঙ্কির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম বাকরুদ্ধ হয়ে। সেই রিঙ্কি ? আমার শৈশবের প্রথম বন্ধু রিঙ্কি। প্রতিদিন রাগ করে গাল ফুলানো মেয়েটা, মাথায় দুইটা বেনী করে আমার হাত ধরে লাফাতে লাফাতে স্কুলে যাওয়া মেয়েটা। কলেজে ঢুকার দুই বছর যেতে না যেতেই সেই চুপচাপ শান্ত মেয়েটা প্রেগন্যান্ট। আমার চোখের সামনে সেলিমের খোঁচা খোঁচা দাড়ি ওয়ালা চেহারা, সন্দেহপূর্ণ চোখ দুইটা ভেসে উঠলো।

আমি কি রিঙ্কিকে ভালোবাসি? জানিনা ? কখনও রিঙ্কির সাথে প্রেম করছি-এরকম ব্যাপারটি কল্পনায় আসেনি। তার জন্য আমার অনুভূতিটা ভালোবাসা থেকে বেশি কিছু। আমি সেটা সারাটা জীবন খুব সাবধানে গোপন করে রেখেছি। সে যখন বাইরের কলেজে পড়ার অতি আগ্রহ নিয়ে পড়তে চলে গেলো, তখন একটু মন খারাপ হয়েছিল। তারপর সে যখন লাজুক ভাবে জানালো, জানিস আসিফ আমি না রিলেশনে যাচ্ছি। তখন হালকা ধাক্কা খেয়েছিলাম বুকের ভিতরে চাপা দুঃখ লাগলেও এতটা খারাপ লাগেনি। আজ ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছে কেন? সেদিন রাতের বেলা ভেবেছি আমি। নিজেকে প্রশ্ন করছি। রিঙ্কিকে ভালো বাসতাম, না কেয়ার করতাম বন্ধুর মতই? তাও কেন এই তীব্র ক্রোধ? এটার উৎস কি ঈর্ষা?.আমি কি আসলে নিজেকে সেলিমের জায়গায় কল্পনা করছিলাম, সেলিমের জায়গায় তো

Scanned with CamScanner

আমিও থাকতে পারতাম, একটু সাহসী হলে। আচ্ছা তাদের বিয়ের পর বাচ্চা হলে আমার কি অনুভূতি হত ? নাহ্ ভালই লাগতো।

তবে রিঙ্কিকে সেদিন একটুকুও দ্বিধান্বিত দেখিনি। ওর মুখে কিসের যেন একটা আভা ? মাতৃত্বের গর্ব। সেটা কিভাবে সম্ভব ?

"কিভাবে এটা হলো রিঙ্কি ?"

"কিভাবে হলো মানে ?"

"মানে সেলিম কি তোকে জোর করে..... ?"

"নাহ"

"হুম্ ! তাহলে ?

"আমিই তাকে চেয়েছিলাম,

তার পুরোটা। বড়ো ভালোবাসেরে ছেলেটা আমাকে।"

"অঃ এখন কি করবি ?"

"কি করবো মানে ?" সেলিম বাড়িতে তার বাড়ির লোক জন পাঠাবে। দু-মাসের মধ্যে ঝামেলাটা সেরে ফেলবো বুঝলি হাঁদারাম ? তুই থাকবি আমার মেইন গেষ্ট। তোকে আমি এক সপ্তাহ আটকে রাখবো হুম"।

আমার এক সপ্তাহ নষ্ট হয়নি। একটা রাত নষ্ট হয়েছিল। মর্গে। মেয়েটা পাঁচতলা ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ার আগে কি ভেবে কাজটি করেছিলো আমি এখনও মাঝে মাঝে সেটা নিয়ে ভাবি। একটা সম্পর্ক যে কয়টা বিষয়ের উপর টিকে থাকে তা হলো একটা 'রহস্য' ছেলেটা তার আনন্দ লালসা মিটাবার পর দায়িত্ব নেবার ভয়ে মেয়েটাকে ছুড়ে ফেলে পালাবে। এটা সেই চিরপুরাতন গল্প আর কতবার এই ঘটনা ঘটলে তারা বুঝবে আমি জানি না। বারবার একই ভুল। ভুলের মাশুল আমার রিঙ্কিকে দিতে হয়েছে। সে কাউকে কিছু বলেনি। সেলিমও নিশ্চয়ই এখন অন্য কোন মেয়েকে নিয়ে ঘুরছে নতুন কোন রিঙ্কি। আর আমি হারিয়ে যাওয়া বন্ধুটিকে তারার মাঝে খুজি ছাদে বসে বসে। বন্ধুটি খুব মন খারাপ করে গভীর রাতে

Scanned with CamScanner

ফোন দিয়ে বলতো "এই হারামী, ছাদে আয়, তারা খসে পড়ছে দেখ কি সুন্দর!" আমার তারাটা খসে পড়ে গেছে, তার খবর কেউ রাখেনি।

:::::::::::

Scanned with CamScanner

সমাজ ও বিলাসিতা

— আস্তিক প্রামাণিক, বি.এ. দ্বিতীয়বর্ষ (বাংলা সান্মানিক)

মানুষ যেমন সমাজবদ্ধ জীব, ঠিক তেমনি রীতি-নীতি ও বিলাসিতাবদ্ধ জীব। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ সমাজের কোনো না কোনো রীতি-নীতি, নিয়ম-বিধি মেনেই চলেন, তবে কেউ কম আবার কেউ বেশি। সমাজের একদল পন্ডিত ব্যক্তি যারা সর্বসংস্কার, রীতি-নীতি পালন কেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আর একদল পন্ডিত ব্যক্তি সমাজের মূল সংস্কারগুলিকে অগ্রাহ্য করে তাদের সংস্কার, রীতি-নীতিকে কুসংস্কার বলে গণ্য করেন। পূর্বযুগগুলিতে যদিও রীতি-নীতিকে কুসংস্কার, বিলাসিতার পরিমাণ ও যন্ত্রণা বেশি ছিল, তবুও এই আধুনিক যুগে কিছু কিছু সামাজিক ভুলভ্রান্তি ও কুসংস্কার থেকেই গেছে ।এমনকি বিভিন্ন রীতি-নীতি ও সংস্কার পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ ক্রমশ বিলাসিতায় মত্ত হয়ে উঠেছে। নিম্নে বিভিন্ন রীতি-নীতি, বিলাসিতা ও কুসংস্কার আলোচিত হল।

পূজার্চনা ও বিলাসিতা ঃ:: বর্তমান সমাজে ধর্মপালন বিশেষ করে পূর্জাচনার দিকটি নিকৃষ্ট পর্যায়ে অবস্থান করেছে। পূজার্চনা শব্দটির অর্থ হল-'দেব-দেবীদের সঠিক আরাধনা।' কিন্তু আধুনিক যুগে মানুষ এই আরাধনায় এতটাই মত্ত হয়ে উঠেছে যে তারা বুঝতেই পারছেনা কিংবা বুঝেও বিশেষ ভাবনা-চিন্তা করে না যে কোনটা ধর্মের পক্ষে অনুচিত আর কোনটা উচিত । পূজার্চনার বিলাসিতায় সবচেয়ে অনুচিত কার্য—'মদ্যপান'। কিন্তু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রায় সকলেরই এই ভুলটি করে থাকে, যার ফলে অনেক সদ্যযুবক তাদের অনুসরণের মধ্য দিয়ে বিপথে অগ্রসর হচ্ছে। মদ্যপ ব্যক্তিদের মদ্যপান দেখে এই সমস্ত যুবকরা সেই বিষয়টিকে 'অমৃত' বলে মনে করছে। এর ফলে তাদের জীবনে কখনো আসে জোয়ার, কখনো ভাটা। আর এই সমাজে দেখা দিয়েছে নানান বিবাদ ও রক্তারক্তি কান্ড। এছাড়া ও উচ্চ শব্দের বোমা পটকা ও বক্স-এর শব্দ ছোটো ছোটো শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এমনকি কিশোর কিশোরীদের সহ্য করা অন্তরায় হয়ে উঠেছে। দিনেরবেলা গান বাজানোর সাথে তারা রাত্রিতেও গান অত্যধিক সাউন্ডে বাজিয়ে থাকে, যার ফলে অনেক শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ব্যঘাত ঘটে। যদিও আরও বিভিন্ন ধরণের বিলাসিতা রয়েছে, সেগুলিকে

Scanned with CamScanner

তৎক্ষনাৎ এর জন্য হয়তো মানিয়ে নেওয়া যায়। সুতরাং এই সমস্ত বিলাসিতার অবসান ঘটিয়ে আমাদের কর্তব্য সঠিকভাবে দেব-দেবীদের আরাধনা করা। আর এর জন্য পুলিশি হস্তক্ষেপ ও কঠিন আইনী পদক্ষেপ সমাজে প্রচলন করা উচিত।

বিবাহবন্ধন ও বিলাসিতা ঃ সমাজের বিলাসিতায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে 'বিবাহবন্ধন।' 'বিবাহবন্ধন' কথাটির মানে নর ও নারীর মিলন সম্পর্ক। কিন্তু বর্তমানে এই সম্পর্কের পাশাপাশি মানুষ বিলাসিতায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে। সমাজ গঠনে নর ও নারীর দুজনেরই প্রয়োজন, তবে কেন পাত্রের পিতারা সব্জিওয়ালাদের মতো কন্যার পিতাদের কাছে কন্যা বিক্রি করবে? একজন মানুষ যেমন ব্যাগ হাতে বাজারে গিয়ে আলু, পটলের দর কষাকষি করে, ঠিক তেমনি ছেলের বাবারাও মেয়েদের বাবার কাছে নিজের ছেলের দর কষাকষি করে। সুতরাং বিবাহ বন্ধন সমাজে বিলাসিতার রূপ ধারণ করেছে। পরিণয় সূত্রে বন্ধন হওয়ার সাথে সাথে সুখের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। যে সমস্ত মানুষের অর্থাভাব রয়েছে; সুন্দর হৃদয় ও রূপ রয়েছে তবে স্ত্রীকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার ক্ষমতা নেই তাদের কাছে হয়তো এই 'দেনা-পাওনা' প্রথাটি বড় হয়ে ওঠে। তাই বলে যাদের সুকর্ম, গাড়ি, বাড়ি সমস্ত রয়েছে তারা কেন শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সব্জিওয়ালা বানাবে? সব্জিওয়ালা ও পাওনা ওয়ালা'র মতো যদি এই প্রথাটি উঠে যায় কিংবা ঠিকঠাক ভাবে প্রচলিত হয় তবে একদিন ধনী-দরিদ্রের বেড়াজালের মধ্যে সমতা আসবে এবং সমাজ নতুন আলোকে ঝল্‌মল্ করে উঠবে।

শিশুশ্রমিক ও বিলাসিতা ঃ :: বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় দেড়শো কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছে। তাদের একটাই ধারণা বেশি সন্তানের মধ্যে দিয়ে বেশি বেশি অর্থ উপার্জন করে ভারতের সম্রাট-সম্রাজ্ঞীদের মতো জীবনযাত্রা অতিবাহিত করবে। তবে তারা গুরুত্ব দেয় না যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলেও স্থলভাগের বৃদ্ধি ঘটেনা। এই অতিরিক্ত বৃদ্ধির জন্যই দেখা দিচ্ছে মানুষের নানান কর্ম সংস্থানের অভাব। তবে তারা শিশুর পরিমান বৃদ্ধি করলেও তাদেরকে শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে না। যদিও

Scanned with CamScanner

দারিদ্রের একটি ব্যপার সমাজে রয়েছে, তবুও বলা যায় এই যুগে একটি শিশুকে মোটামুটি শিক্ষিত করে তুলতে পিতা-মাতার তেমন ব্যয় হয় না। এছাড়াও সেই সমস্ত পিতা-মাতাদের ধারণা থাকে যে দরিদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করে তার সন্তান কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেনা। এই ধারণা তাদের একেবারেই ভুল। আমরা যদি পূর্বের অনেক মনিষীদের জীবন পড়ি, তবে দেখবো তাঁরা দরিদ্র বংশে, জন্মগ্রহণ করেও কেউ হতে পেরেছেন রাষ্ট্রপতি, কেউ কবি, কেউ আরও অনেক কিছু । সুতরাং যুক্তির দ্বারা এটাই প্রমানিত হয় যে, পিতা মাতারা তাদের শিশুদের শিশুশ্রমিক বানিয়ে বিলাসিতায় মত্ত হয়ে সমাজটিকে নরক করে তুলছে।

পৈতৃক সম্পত্তি ও বিলাসিতা ঃ:: সমাজে বর্তমানে যেটি অতি নিকৃষ্টরূপের বিলাসিতা দেখা দিয়েছে তা হল -পৈতৃক সম্পত্তির বিলাসিতা। পিতা-মাতারা সন্তানদের জন্ম দিয়ে কতই না আর করে থাকে! আর সন্তানেরা বড়ো হয়ে তাদের আশাভঙ্গ করে নতুন যৌবনের লীলাখেলায় মত্ত হয়ে পিতা-মাতাদের ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এর ফলে দেখা যায় পিতা-মাতাদের বৃদ্ধাশ্রমে গমন ও ভিক্ষুক জীবন। এছাড়াও পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভ্রাতারা পরস্পরের মধ্যে নানান বিবাদ, সম্পর্ক ভাঙ্গা গড়া এমনকি আইনী পদক্ষেপও করে থাকে। সুতরাং আমাদের নব যুবকদের কর্তব্য লীলাখেলায় মত্ত ও উম্মাদ না হয়ে পৈতৃক সম্পত্তি শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে সকলের সাথে মিলেমিশে একান্নবর্তী পরিবার গঠন করা।

কুসংস্কারের সমাজ ঃ ::- সমাজ নানান রীতি নীতির সাথে কুসংস্কারেও পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ তুলে না ধরে নিম্নে কিছু কুসংস্কার তুলে ধরা হল—

১) মৃত্যুর পর শ্মশানে থেকে সকলে মিলে ভোজ-আহারাদি করা;
২) মৃত্যু শ্রাদ্ধের পর বাড়িতে ধুম্‌ধাম্ করে ভোজের ব্যবস্থা করা;
৩) রাস্তায় বিড়াল চলা দেখে পিছপা হওয়া;
৪) বিয়েতে পণ গ্রহণ;
৫) বাড়ির পূজোতে ব্রাহ্মণ পূজকদের অতি পরিমাণ সামগ্রী দান;

Scanned with CamScanner

সমাজের এই সমস্ত বিলাসিতা কুসংস্কার, রীতি নীতি থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদেরকে প্রথমত সচেতন হতে হবে, মনুষ্যত্ব বোধকে জাগ্রত করতে হবে; ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজের মুক্তির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতে হবে। তবে এই যুদ্ধ কোনো ছুরি অস্ত্রের যুদ্ধ নয়; নতুন ভাবনা-চিন্তা, নব সূর্যোদয়ের যুদ্ধ। কথায় আছে সমাজ যেখানে অশিক্ষিত সেখানকার সমাজ তেমনি দুর্বল, নিয়ন্ত্রণহীন। সুতরাং সমগ্র সমাজে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। মানুষ মানুষের পাশে থাকবে, সহযোগিতা করবে, বুদ্ধিপ্রদান করবে, নিজের ভাবনার সাথে অপরকেও ভাবিত করে তুলবে। সর্বোপরি দরকরে হলে জোড়পূর্বক ও আইনী শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষিত মহল থেকে অশিক্ষিত মহলে শিক্ষার আলোকরশ্মি পৌছে দিতে হবে। তবেই একদিন সুন্দর, সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ে উঠবে এবং মুক্তি পাবে তাদের নানান কু-বিলাসিতা, রীতি-নীতি ও কুসংস্কার।

::::::::::

Scanned with CamScanner

অরঙ্গাবাদের পূর্ব ইতিহাস

— মোকারিম সেখ, বি.এ. তৃতীয়বর্ষ (ইতিহাস অনার্স)

"অনাগত ভবিষ্যৎ ছুটে এসে দখল নিচ্ছে বর্তমানের আঙিনা, আজকের বর্তমান হারিয়ে যাচ্ছে অতীতে, হচ্ছে ইতিহাস"

অরঙ্গাবাদ বর্তমানে আজ একটি বিড়ি শিল্পে সমুন্নত শহর। এই শিল্পের ওপর নির্ভর করে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবিকা নির্ভর করে। ফলে তারা পেয়েছে খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকার ভরসার স্থল। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে আমাদের জগৎ ও জীবনের রূপ। এগিয়ে যাচ্ছে সে ভাঙা-গড়া, ওঠা-পড়া, পাওয়া-হারানোর পথ ধরে। বর্তমান সভ্যতা, সংস্কৃতি, রীতি-নীতির সাথে তালে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে এতটাই আমরা নিজেদের কে মিশিয়ে ফেলেছি যে, ভূলে যাচ্ছি আমাদের অতীত ইতিহাসকে।

আজকের অরঙ্গাবাদ যার পূর্ব নাম ছিল 'মঙ্গলপুর বাজার' অরঙ্গাবাদের নিকটবর্তী মহেশাইল গ্রামে মঙ্গল সেন নামে একজন রাজার বাসভূমি ছিল। যিনি গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের অধীনে কর্মরত ও উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। মহেশাইল দীঘির দক্ষিণ পাড়েই ছিল রাজার রাজভবন ও প্রাসাদ। বর্তমানে যার অস্তিত্ব অবলুপ্ত । কথিত আছে-গঙ্গার একটি শাখাকে বাঁধ দিয়ে এই দীঘির সৃষ্টি। ছোট-খাট গঞ্জ জাতীয় এক জনপদ তার নামানুসারে নাম হয়-মঙ্গলপুর বাজার। পরবর্তীতে, মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নামানুসারে এই স্থানটির নাম হয় 'অরঙ্গাবাদ'।

মোঘল ও নবাবী আমলের বহু ঘটনার সাথে সুতি থানার নানাঞ্চল যুক্ত থাকার ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। অরঙ্গাবাদের উত্তর প্রান্তে দিয়ে প্রসারিত ছিল 'বাদশাহী সড়ক' । যেটি মুর্শিদাবাদ থেকে রাজমহল পর্যন্ত যুক্ত ছিল। মোঘল ও নবাবী আমলে এটি ছিল স্থল পথে যাতায়াতের একমাত্র প্রশস্ত ও বিস্তৃত পথ। মীর জুমলা একদিন ঔরঙ্গজেবের পুত্র শাহসুজাকে এই পথ দিয়েই তাড়া করেছিলেন। এছাড়া বাংলার নবাব আলিবর্দি খান রাজমহল থেকে এই পথ দিয়ে তার দৌহিত্র গিরিয়ার নবাব

Scanned with CamScanner

সরফরাজের বিরুদ্ধে আর কুন্দলিয়ার প্রান্তে সংঘটিত সুতির যুদ্ধে বা গিরিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত করে বাংলার নবাব হন। এই পথ দিয়েই ক্যাপ্টেন অ্যাডামস মিরজাফরের জামাতা মীর কাশিমের যুদ্ধাভিযান চালান। বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে জড়িয়ে আছে অরঙ্গাবাদ তথা সুতির নানাঞ্চল।

এই স্থানটির চরিত্রগতও রূপগত পরিবর্তন ঘটতে লেগেছিল বহুকাল। কিছু টিন টালির দোকান ঘর, কাঁচা রাস্তা, কয়েকটি ছোট-বড় পাকাবাড়ি। ২/৩টি মিষ্টির দোকান, ছোট করে ছিল একটা সব্জি ও মাছের বাজার। একমাত্র যান ছিল—গোরুর (বলদ) গাড়ি রাত্রে ২/১ টি গ্যাসবাতি ও হ্যাচাক ছাড়া লন্টনের একাধিপত্য। প্রায় ১০০ বছর আগে সেই ছিল অরঙ্গাবাদের রূপ ও অস্বিত্ব।

আজ থেকে প্রায় ৬০/৭০ বছর আগেও এই অঞ্চলের মানুষের অবস্থা ছিল বড়ই দীন। না ছিল রাস্তাঘাট, না ছিল রোজগারের পথ, না ছিল কোন শিক্ষা স্বাস্থ্যর সু-ব্যবস্থা । কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মারাত্বক রোগে আক্রান্ত হলে মানুষের জীবন নির্ভর করত ঈশ্বরের আশির্বাদের ওপর। এই রকম প্রেক্ষাপটে ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মৃণালিনী বিড়ি' শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই বিড়ি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পর মানুষের কর্মের তথা রুজি-রোজগারের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এই শিল্পের দুই কর্ণধার ছিলেন নিবারণ চন্দ্র দাস ও দুঃখুলাল দাস। তাদের প্রচেষ্টায় এই অঞ্চলের শিক্ষার আলো প্রস্ফুটিত হয়। এদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়—ছাবঘাটি ক্ষুদিরাম দাস বিদ্যালয়। এই ক্ষুদিরাম দাস ছিলেন এই ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতৃদেব। এছাড়া অরঙ্গাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, অরঙ্গাবাদ বালিকা বিদ্যালয় আর বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরবর্তী প্রজন্মে-বিড়ি শ্রমিক, শিল্পপতি সকলের অর্থ সাহায্য নিয়েই তাদের উত্তর সুরীগণ-অরঙ্গাবাদ দুঃখু লাল নিবরণচন্দ্র মহাবিদ্যালয় (১৯৬৭) প্রতিষ্ঠা করেন। যা এই এলাকার ও পাশ্ববর্তী বহু অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের উচ্চ-শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেয়।

Scanned with CamScanner

মা

—সুস্মিতা সরকার
বি.এ দ্বিতীয় বর্ষ (বাংলা বিভাগ)

আকাশ ভরা সূর্য তারা ভুবন ভরা ধন,
'মা'য়ের মতো হবে না আর কারো মন।
এ জগতে হায় 'মা' নাই যার,
সেই শুধু বোঝে, কেমন কষ্ট তার।
কিন্তু 'মা' তো 'মা'-ই হয়,
পরলোক থেকেও আর্শিবাদ করে যায়।
তাঁর সন্তানরা যেন থাকে দুধে-ভাতে,
সর্বদা চলে সত্যবাদিতার সাথে ।

Scanned with CamScanner

অবুঝ মন

—মনীষা চৌধুরী
বি.এ দ্বিতীয় বর্ষ (বাংলা বিভাগ)

হিয়ার মাঝে আছো তুমি আঁধার-আলোর আবছায়াতে
মিষ্টি হাসির দুষ্টুমিটা, হারায় আমার কল্পনাতে।

তাঁর ছেঁড়া এই হৃদয়টিতে হঠাৎ তুমি উঠলে ভেসে
স্বপ্নদোলায় দুলিয়ে গেলে অকারণে রাত্রিশেষে।।

পারিনি ত ভুলতে তোমায় ফিরে আসো বারে বারে
নিত্য থাকো আমার সাথে বেদনারই হাহাকারে।

বর্ষা শরৎ বসন্তটা আর এ শীতের সকাল সহ
টানতে তোমায় মনমাঝারে করছে বড় ষড়যন্ত্র।।

মনটি আমার অবুঝ হয়ে ডাকছে তোমায় ফাল্গুনেতে
জানে নাকো ভালোবাসার সুখটি আছে দূরে থেকে।

Scanned with CamScanner

মা

—শুক্লা চৌধুরী
বি.এ. তৃতীয় বর্ষ (দর্শন, অনার্স)

মা দেখান জগতের আলো,
তাই তো মাকে বাসি এত ভালো।

মাকে দিয়ো নাগো কষ্ট,
না হলে সর্বকিছুই হবে ভ্রষ্ট।

মা যখন বলতে শেখান কথা।
মায়ের নামে ভুলে যে যাই, সকল দুঃখ
ব্যথা

মা যে আমার প্রাণের পরম সই,
তাই সকল কথা শুধু তাকেই কই।

Scanned with CamScanner

বড়ো প্রশ্ন

—বুবাই কুমার দাস
বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ (দর্শন, অনার্স)

শুরুর সাথে শেষের লড়াই
জন্মের সাথে মৃত্যুর।
সূর্যের সাথে পৃথিবীর লড়াই
মনের সাথে কার ?

জয়ের সাথে পরাজয়ের লড়াই
ধর্মের সাথে অধর্মের।
বণিকের সাথে জোদ্দারের লড়াই
জীবনের সাথে কার ?

আলোর সাথে অন্ধকারের লড়াই
বন্ধুর সাথে শত্রুর।
জমিদারের সাথে কৃষকের লড়াই
বিজ্ঞানের সাথে কার ?

দেশের সাথে বিদেশের লড়াই
আসার সাথে যাওয়ার।
একের সাথে সংঘের লড়াই
ভালোবাসার সাথে কার ?

Scanned with CamScanner

গ্রামের সাথে শহরের লড়াই
পন্ডিতের সাথে মূর্খের।
গরীবের সাথে ধনীর লড়াই
টাকার সাথে কার ?

কল্পনার সাথে বাস্তবের লড়াই
ভালোর সাথে মন্দের।
অন্যায়ের সাথে ন্যায়ের লড়াই
সৃষ্টি সাথে কার ?

Scanned with CamScanner

দুটি কবিতা ঃ

—অধ্যাপক রাজন গঙ্গোপাধ্যায

বিসর্জন

জেনো আমি চিরদিন তোমারই পায়ে পায়ে
ঘোরা বেড়ালের মতো
পথে পথে সেভাবেই ঘুরি।
ঘুম আসে; ঘুম চলে যায়
তোমার বাড়ির ছায়া এসে পড়ে আমার দেয়ালে
আর যারা লতা-গুল্ম-বৃক্ষ ভাই-বোন
ঘিরে রেখেছিল তোমাকে আমাকে
আর যারা অসুস্থ রুগীর মতো রোদের
ভিতরে হেঁটে গেল
আমরাও তাদেরই মতন ঠোঁট থেকে
মুছলাম চুম্বনের জল
কিছু পাতা ঝরে যায়, দু-একটি পথ বেঁকে
অন্যরকম
শুধু বন্ধ দরজার শব্দ শোনা গেল, যেন
এইমাত্র কেউ—
বিসর্জন দিয়ে এল কাউকে।

Scanned with CamScanner

সভাকবি

রাজার পায়ের কাছে বিড়াল
চোখের তার আহ্লাদের ঝিলিক
লেজে আদরের গান
বিড়াল মুখ ঘষে রাজার পায়ে
চোখ তার নিবু নিবু
ভাবে, এবার ঠিক উঠে পড়বে কোল;
বিড়ালের মাথার উপরে রাজা
চোখে তার শাসনের দ্যুতি
হাতে সুগন্ধ ক্ষমতার
রাজা পোষে বিড়াল
ভাবে শব্দ তার দাসী, ছন্দ অনুদাস।

Scanned with CamScanner

একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়াপর্বের সূচনায় অনুষ্ঠানমঞ্চ

ভিকট্রি স্ট্যান্ডে বিজয়ীদের শংসাপত্র প্রদান

এন.এস.এস. প্রোগ্রামের প্রস্তুতি

Scanned with CamScanner

দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র কলেজ, অরঙ্গাবাদ

কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

Scanned with CamScanner